তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ

উনিশ শতকে বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ ও বহুবিবাহের কারণে আমাদের সমাজে বিধবা নারীর সংখ্যাধিক্য প্রভূত পরিমাণ হয়েছিল। সমাজে দেখা দিয়েছিল-নারীর প্রণয় ঘটিত নানা ব্যভিচার। সমাজ কলুষতার তীব্রতায় পৌঁছে গিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল ভ্রূণ হত্যা, অবৈধ গর্ভপাত, অবৈধ প্রণয়, বেশ্যাবৃত্তি। গ্রামের বঞ্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল, নব্য বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে। এই সমাজ সংকটে খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল বিধবার পুনর্বিবাহের।

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে হিন্দু বিধবারা আচার সর্বস্বতার যূপকাষ্ঠে বলি হতে হতে কুপথে পা বাড়াতে একরকম প্রায় বাধ্য হয়েছিল। তার উপর বিধবার সম্পত্তি দখল, জীবনাচারের হাজার বিধিনিষেধের বেড়াজালে জীবন-যৌবন রূপ, রস, গন্ধহীন হয়ে উঠেছিল। নারীর বৈধব্য-আচার পালনের এই কঠোরতা বিপত্নীক পুরুষের ক্ষেত্রে নেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণোত্তর পুনর্বিবাহ করতে পারে তবে স্ত্রীলোক কেন স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করতে পারবেন না। 'নব্যভারত' পত্রিকায় গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহ ও সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন,—"*বিধবাদিগের বিবাহ যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্ব্বিবাহের সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সাম্যলাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, বরং তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। শাস্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা হাতে ছিল বলিয়া বিধবাদিগকে থলিতে পূরিয়াছ, আজ যদি স্ব ইচ্ছায় সেই থালিতে উঠিতে পার, তাহা হইলে স্বীকার করি তুমি প্রকৃত বীর।...শতকরা দুই একটী বাদে কোন কোন বিধবা চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, কখনও করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না? পিঞ্জর-বদ্ধা বিধবা সহায় সম্পত্তি শূন্যা হইয়াও যখন শাস্ত্রের গভীর অনুজ্ঞায় পদাঘাত করে, তখন সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত সহায়-সম্পন্ন পুরুষ বিপত্নীক থাকিয়া যে পত্নী দেবীর অনুধ্যানে জীবনাবাহিত করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায়*

না, সুতরাং ও কঠিন ব্যবস্থায় চরম ফল এই দাঁড়াইবে যে গুপ্ত প্রণয়ের ক্ষেত্র আরও প্রচারিত হইবে এবং ভ্রূণ হত্যার পাপ এক হইতে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে।"[১]

বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে অসঙ্গত আচরণ বলে গৃহীত হয়েছে। বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবাদ,—

"*রাঁড়ী বেটীর বিয়ের সখ*
উনায় রসের কত ঠমক।"[২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা নারীর অসহায়তাকে দরদ দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং এর মুক্তির উপায় খোঁজার চেষ্টা করলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে, পক্ষে-বিপক্ষে লেখা হল একাধিক বাংলা নাটক। বদলে গেল বাংলা সামাজিক নাটকের চেহারা। ১৮৫৬ পরবর্তীকালে বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে নাট্য সাহিত্যে। সমালোচক অশোককুমার মিশ্র লিখেছেন,—"*বিধবা বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদের সুর সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত হয়েছিল বাংলা নাট্য শ্রেণীতে।*"[৩] ১৮৫৬ সাল পরবর্তী সময়কালের বাংলা নাটক রচনার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলা সামাজিক নাটকের কাহিনীবৃত্তে বিষয় হিসাবে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গ। কখনও সহানুভূতিতে, কখন উপহাসে- বিদ্রুপে, কখন মুখরোচক ব্যঙ্গের ঝলকানিতে।

নাটক যেহেতু মিশ্রশিল্প, তাই এখানে যেমন চরিত্রের সংলাপ আছে তেমনি রয়েছে সংগীত। নাটক যখন নাট্যে উপনীত হল তখন যুক্ত হল শারীরিক ও বাচিক অভিনয়। ফলে বাংলা নাটকের সংলাপ নির্ভরতায় নাট্যকারেরা সরাসরি উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে, কখনও সংগীতের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনে, বিরোধিতায় কিংবা মনোরঞ্জন রঙ্গ-তামাসা করেছেন।

আমাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে উনিশ শতকে রচিত প্রায় চল্লিশটির বেশি নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর জীবনাচারের চিত্র। পত্র-পত্রিকা, ও বাংলা নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিদ্যাসাগরকে কৌতুকের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। একাধিক প্রহসনে বিদ্যাসাগরের নাম জড়িয়ে বিধবা বিবাহ নিয়ে কৌতুক রসের অবতারণা করা হয়েছে। 'সাগর' ও 'রাঁড়ের বে' এই জাতীয় শব্দবন্ধ সহযোগে বিধবা বিবাহের মত গভীর ও গম্ভীর বিষয়কে হাস্যরসের খোরাক করে তোলা হয়েছে। যে সমস্ত নাটকে বিধবা প্রসঙ্গ রয়েছে সেগুলি হল,—

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব (১৮৫৪) : রামনারায়ণ তর্করত্ন।

বিধবোদ্বাহ (১৮৫৬) : উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬) : উমেশচন্দ্র মিত্র।

বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬) : রাধামাধব মিত্র।

বিধবা বিষম বিপদ (১৮৫৬) : অজ্ঞাতনামা।

চপলাচিত্তচাপল্য (১৮৫৭) : যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭) : বিহারীলাল নন্দী।

রামনবমী (১৮৫৭) : গুণাভিরাম শর্মা

সপত্নী নাটক (১৮৫৮) : তারকচন্দ্র চূড়ামণি।

বিধবা বিবাহ বিষম দায় (১৮৫৮) : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

নীলদর্পণ (১৮৬০) : দীনবন্ধু মিত্র।

বিধবা বিরহ নাটক (১৮৬০) : শ্রীশিমূয়েল পিরবক্স।

বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০) : শ্যামাচরণ শ্রীমানি।

দলভঞ্জন নাটক (১৮৬১) : হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শর্ম্মা) ।

অজ্ঞাতনামা (১৮৬২) : *বিধবা সুখের দশা*

শুভস্য শীঘ্রং (১৮৬১) : হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) : হরিশ্চন্দ্র মিত্র

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক (১৮৬২, ১ম ও ২য়) : কুশদেব পাল।

অশুভ পরিহারক (১৮৬২) : গৌরমোহন বসাক

পুনর্ব্বিবাহ নাটক (১৮৬২) : গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশুভস্যকালহরণং (১৮৬৩) : গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী।

বিধবা বিলাস নাটক (১৮৬৪) : যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নবনাটক (১৮৬৬) : রামনারায়ণ তর্করত্ন।

বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) : দীনবন্ধু মিত্র।

মেঘনাদবধ নাটক (১৮৬৭) : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গকামিনী নাটক (১৮৬৮) : হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু মহিলা নাটক (১৮৬৮) : বিপিনমোহন সেনগুপ্ত।

সাক্ষাৎ দর্পণ (১৮৭১) : অজ্ঞাতনামা।

বিধবার দাঁতে মিশি (১৮৭৪) : গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শরৎ সরোজিনী (১৮৭৪) : উপেন্দ্রনাথ দাস।

বিধবা বঙ্গবালা (১৮৭৫) : অজ্ঞাতনামা।

সন্তাপিনী নাটক (১৮৭৬) : জনৈক ভদ্রমহিলা

বিধবা (১৮৭৭) : নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সরোজা (১৮৭৭) : রাধারমণ কর :

এমন কর্ম্ম আর করব না (১৮৭৭): জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গবিধবা (১৮৮২) : বিরজামোহন চৌধুরী।

বিধবা সঙ্কট নাটক (১৮৯০) : অজ্ঞাতনামা।

তরুবালা (১৮৯০) : অমৃতলাল বসু।

বিলাপ ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন (১৮৯১):অমৃতলাল বসু।

বিধবা কলেজ (১৮৯২) : অতুলকৃষ্ণ মিত্র ।

বাবু (১৮৯৪) : অমৃতলাল বসু।

উক্ত নাটকগুলির কাহিনী পরিচয় থেকে বিধবা নারীদের অবস্থানগত দিকগুলি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা একে একে নাটকগুলির কাহিনী পরিচয় তুলে ধরব।

১৮৫৪ সাল নাগাদ যখন বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সচেতনতা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই সময়কালে রামনারায়ণ তর্করত্নের *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* (১৮৫৪) নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়। *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটক রচনার একটা ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ১৮৫৩ সালের ৮ই নভেম্বর 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

''বিজ্ঞাপন।

৫০ টাকা পারিতোষিক

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচরণ রায় চৌধুরী

কুণ্ডী পং জমিদার।"[৪]

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার তিন মাসের মাথায় ১৮৫৪ সালের ১০ই মার্চ তারিখে *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটকের পাণ্ডুলিপি ও একটি চিঠিসহ পাঠিয়ে দেন জমিদার শ্রীকালীচরণ রায়চৌধুরীর কাছে।[৫] *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটকটি রচনা করার জন্য রামনারায়ণ রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরীর কাছ হতে ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৪ সালের শেষভাগে এ নাটক প্রকাশিত হয়। সমকালে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'* পত্রিকার ৩৫তম খণ্ডে *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের সমালোচনায় লেখা হয়,—"*বল্লালসেনীয় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে' অভিনয়দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প।*"[৬] ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়ির 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে' রামনারায়ণ তর্করত্নের *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটকের অভিনয় হয়।

কৌলীন্য প্রথার কুফল দেখিয়ে ছয় অঙ্কে রচিত হয় *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটক। এ নাটকের মূল লক্ষ্য, কৌলিন্য ও বহুবিবাহ রীতির সমালোচনা হলেও—সমকালীন সমাজ সমস্যাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে নাট্যকার প্রাসঙ্গিক ভাবে বিধবার সমস্যা, সংকট ও বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গকে উত্থাপন করেছেন। রামনারায়ণ কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ ছিলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রেরিত আবেদনপত্রে রামনারায়ণ সম্মতি স্বাক্ষর করেছিলেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রামনারায়ণের পূর্ণ সমর্থন ছিল। *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* ছাড়াও রামনারায়ণের *'নবনাটকে'* (১৮৬৬) উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গ।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে নাট্যকার লিখেছেন,—"*কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গ দেশের যে দূরাবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।*"[৭] *'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'* নাটকের কাহিনীতে রয়েছে, কুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় চার কন্যার বিবাহ নিয়ে চিন্তিত। অনৃতাচার্য ও শুভাচার্য দুই ঘটককে পাত্র সন্ধানের কাজে নিযুক্ত করলেও কোনো সুরাহা হয়নি। অবশেষে ষাট বছরের এক প্রবীণ পাত্রের সন্ধান মেলে। কপট ঘটক অনৃতাচার্য একশ টাকার লোভে বৃদ্ধ এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে চার কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কুলপালক কন্যাদায় হতে মুক্ত হতে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। কুলপালক, তাঁর চার মেয়েকে বিয়ের

কথা জানালে বয়স অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বড় কন্যা জাহ্নবী বিষাদে নিমজ্জমান হয়েছে, মধ্যম কন্যা শান্তবী আশ্চর্যান্বিতা হয়েছে, কামিনী যৌবন জ্বালায় পীড়িত ভাবের উপশমের স্বপ্ন দেখেছে এবং কনিষ্ঠ কন্যা কিশোরী উৎসুক হয়ে উঠেছে বিয়ের জন্য। এই বিয়ের অন্তরালে রয়েছে বেদনা ও করুণার প্রকাশ। কুলপালকের জেষ্ঠ্য কন্যা জাহ্নবী তাঁর বোধবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে এমন বরকে বিবাহ করা মানে বৈধব্যের নামান্তর। আক্ষেপের সঙ্গে জাহ্নবী জানিয়েছে,—"*এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল।*"[৮]

এর পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে, কুলীন বিবাহ বণিকের বিবাহ নির্ভর জীবীকাপালনের চিত্র। বিবাহবণিক মুখোপাধ্যায়ের অর্থ জড় করার জন্য ফর্দ খুলে দেখে নিয়েছে স্থানীয় অঞ্চলে কোথাও বিবাহ করেছেন কিনা! পথে উত্তম নামক এক যুবকের কাছে শ্বশুর গৃহের সন্ধান করতে গিয়ে বিবাহবণিক জানতে পারেন, উত্তম তাঁরই পুত্র। বিমলপুর গ্রামে যে স্ত্রীর কাছে তিনি যাচ্ছেন, উত্তম সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে, লোক পরম্পরায় বিবাহবণিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উত্তমের মা বৈধব্য বেশ ধারণ করে বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেছে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ছিলেন, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিণাভীতে বসবাস করতেন। নিজে স্বধর্মে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কুলীন আচারের অসারতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। নাট্যকার এ নাটকে নারীর অসহায়তার বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন।

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *'বিধবোদ্বাহ'* (১৮৫৬) নাটক প্রকাশের সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে *'সম্বাদ ভাস্কর'* পত্রিকার ৬৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় অংশে। সম্পাদকীয় অংশে লেখা হয়,—"***বিধবোদ্বাহ নাটক*** *উক্ত নামে এক নবীন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে কোন ভদ্র সন্তান এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া পুলক পরিপূর্ণ হইলাম, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষার এতাদৃশ নাটক প্রকাশ হয় নাই। পূর্ব্ব কালীন লোকেরা নাটক প্রকাশ করণীয় রীতি বর্ত্মই জানিতেন না, তিন বৎসরের অধিক হইল ৺প্রাপ্ত বাবু তারাচরণ শীকদার যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষার ইংরাজীর অনুবাদ করিতেন তিনি "**ভদ্রার্জ্জুন**" নামে এক নাটক প্রকাশ করেন তাহা যদিও শুদ্ধ হইয়াছিল তত্রাচ সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ হয় নাই, পরে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের যত্নে "**কুলীন কুল সর্ব্বস্ব**" নামে এক নাটক প্রকাশ হয় এবং তিনিই বঙ্গভাষায় **বেণীসংহার** নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, কয়েক দিবস গত হইল "**বিধবা বিষম বিপদ**" নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি তাহাও বিধবা বিবাহোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে*

*এবং বঙ্গভাষায় **অভিজ্ঞান শকুন্তলার** যে অনুবাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি, কোন নাটক এ নাটকের তুল্য হয় নাই, সৎপাত্র কুলীন পুত্র মহাশয় এতদ্‌গ্রন্থে যে সকল আশয় বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর সকল রস একত্র হইয়াছে, আমরা গ্রন্থ পাঠ কালীন তাহা দুই হস্তে সমানভাবে রাখিয়াছিলাম, পাছে অপূর্ব্ব রস টস্ ২ করিয়া পড়িয়া যায় এই কারণ কোন দিগ নিম্নভাগে রাখি নাই যদি গ্রন্থপতি দ্রুতগতি না হইতেন আর নাটক বিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দেখাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করাইতেন তবে আমরা সাহসে বলিতে পারিতাম এই নাটক দোষ রহিত সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মধ্যে২ ভাব স্থির রাখিতে পারেন নাই, এদেশের স্ত্রী-পুরুষেরা কথোপকথনে যে সকল ভাষা ব্যবহার করেন না স্ত্রী পুরুষদিগের উক্তি স্থলে সেই সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন ইহাতে পাঠকেরা পাঠ মাত্রই জানিতে পারিবেন ঐ সকল উক্তি স্ত্রীপুরুষ-দিগের উক্তি নয়, গ্রন্থ কর্ত্তা স্ত্রী পুরুষের উক্তি বলিয়া আপনি লিখিয়াছেন। এতদ্দেশীয়া বনিতারা কি কথায় কথায় কবিতা করিতে পারেন। নাপিনীরা কি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে কথায়২ কবিতা করিতে পারে? ভদ্র জাতীয় পুরুষেরা কি বাক্যালাপ-কালীন স্ত্রী ভাষা অর্থাৎ মেয়েলী ভাষা বলেন? **বিধবোদ্বাহ** নাটকের কোন২ স্থলে এই প্রকার ভাষা ব্যবহার হইয়াছে যদিও এ দোষ সামান্য দোষ বটে তত্রাচ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী চার্ব্বঙ্গীদিগের গালভালে বিন্দুমাত্র স্থিতি থাকিলে যেমন সুধাসিন্ধু বদনকেও ইন্দু বলা যায় না এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থও সেইরূপ হইয়াছে।'"*[৯]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৮৫৭ সালের ২১মে তারিখে *'বেঙ্গল হরকরা'*য় একজন সংবাদদাতা লেখেন,—"*নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগের ফলে বহু হিন্দু যুবক দেশীয় পাড়ায় অস্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় আশুতোষ দেবের বাড়ীতে 'শকুন্তলা' এবং তাহার পর সিংহ-বাবুদের বাড়ীতে 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু যুবক শীঘ্রই 'বিধবোদ্বাহ' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিবেন। প্রথমোক্ত নাটকটির অভিনয় কাঁশারিপাড়া-নিবাসী মুৎসুদ্দী বাবু মহীন্দ্রলাল বসুর বাড়ীতে হইবে। ইহা দেশের পক্ষে খুব মঙ্গলের লক্ষণ এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন।"*[১০] *'প্রবোধচন্দ্রোদয়'*ও *'বিধবোদ্বাহ'* নাটক অভিনয় আয়োজনের কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়েছিল উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ'* নাটক। অনেক অনুসন্ধানেও নাটকটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

১৮৫৬ সালের ২৩ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পর পরই — এই বছরেই

প্রকাশিত হয় তিনটি নাটক, উমাচরণ চট্টোপাধ্যাযের *'বিধবোদ্বাহ'* নাটক (১৮৫৬, সংবাদ ভাস্কর), উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ নাটক'* (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্রের *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটক (১৮৫৬)।

'বিধবা বিবাহ নাটকে' (১৮৫৬) বিধবাদের ইচ্ছা ও মানসিকতার নানান প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিধবাদের যন্ত্রণার অবসান হয় খানিক পরিমাণে। তৎকালীন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই আইনের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কিছু কিছু বিধবা মহিলারাও এর প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত জেনেও কুসংস্কার আচ্ছন্ন মন নিয়ে পাপের অংশীদারিত্বের কথা ভেবে বিধবারা দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি জানায়নি। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'টির মধ্যে সমাজের এই জটিল মানসিকতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বিধবারাই বিধবা বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ নাটকে'*র কাহিনী গড়ে উঠেছে সুলোচনা নামক এক কিশোরী বিধবার করুণ কাহিনী অবলম্বনে। *'বিধবা বিবাহ নাটক'* (১৮৫৬) চার অঙ্কে বিন্যস্ত। কীর্তিরাম ঘোষ ও পদ্মাবতীর কন্যাত্রয়—সুলোচনা, রেবতী ও রাইকিশোরী বাল্যবিধবা। পুত্রবধূ সুখময়ীও ভাগ্য বিড়ম্বনায় বৈধব্য যন্ত্রণার শিকার। বিদ্যুল্লতা ও সুখময়ী—দুই বোনের কথোপকথন দিয়ে নাটকের শুরু। সুখময়ী বিধবা (রাঁড়) আর, বিদ্যুল্লতা সধবা মেয়েমানুষ।

বালবিধবা সুখময়ীর খাওয়া পরার কোনো অভাব নেই। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ তার স্বামী নেই। সুখময়ীর সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে নিঃস্ব। বসন্ত এলে তার প্রাণে নিঃসঙ্গতা জাগে। সুলোচনার কাছে বৈধব্যের জ্বালা অসহণীয় হয়ে উঠেছে। বৈধব্য জ্বালা দূর করতে সে পুনর্বিবাহ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তাই সে অকপটে তার মনের অসুখের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত করেছে।

সুলোচনার পিতা কীর্ত্তিরাম বিধবা বিবাহের বিপক্ষে। তার অকাট্য যুক্তি বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কীর্ত্তিরাম রক্ষণশীল, সেকেলে ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। স্বভাবতই তিনি বিধবার পুনর্বিবাহ মেনে নিতে রাজি হননি। তিনি মনে করেন, লুকিয়ে চুরিয়ে বিধবা বিবাহ অন্যায় হলেও সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে বিধবা বিবাহ বিষয়টাই অন্যায় ব্যাপার। তাঁর কাছে গোপনে ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি ভালো। তবু দ্বিতীয়বার বিবাহ ভালো নয়। তিনি দ্বিতীয় বিবাহকে কোনমতেই শাস্ত্রসম্মত বলতে রাজী নন। বন্ধু শ্যামাচরণ, কীর্তিরামকে

বিধবার পুনর্বিবাহের সুফল বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কীর্ত্তিরামবাবু তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'কলি অবতার' বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন।

কীর্তিরাম ঘোষের স্ত্রী পদ্মাবতী তাঁর বিধবা কন্যাদের বিধবা বিবাহে যে আগ্রহ রয়েছে সেকথা জানায়। বিধবা মেয়েরা যে পুনর্বিবাহে উৎসাহী সেটা জানার পর কীর্ত্তিরাম অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বিধবা সুলোচনা, রেবতী ও রাইকিশোরীর মনের ইচ্ছায় কীর্ত্তিরাম ক্রমাগত প্রলাপ বকেছেন। ঘটনাক্রমে দেখা যায়, বিধবা সুলোচনা রামকান্ত বোসের ছেলের প্রতি প্রেমে অনুরক্ত হয়। ক্রমে একে অপরের প্রেমে পড়ে। রামকান্ত বোসের ছেলেকে দেখে সুলোচনার মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যতা তৈরি হয়। সুলোচনা তাঁর প্রেমাবেগ গোপন করতে পারে না। প্রিয় পুরুষের খোঁজ নিতে বিধবা সুলোচনা নাপেতানী রসবতীকে কাজে লাগায়। শুরু হয় সুলোচনার বিরহময় প্রেমজীবন। বিধবা সুলোচনা একক শয্যায় শুধু তাঁর প্রিয় পুরুষটিকেই কল্পনা করে। সুলোচনার বৈধব্য জীবনে নতুন পুলক সঞ্চার হয়। ক্রমশই তা পূর্বরাগ থেকে অনুরাগে পরিণত হয়। নিদ্রাহীন রাত্রী, বিনিদ্রায় পরিণত হয়। ক্রমশ সুলোচনা পুরুষের সান্নিধ্য কামনায় অধীর হয়ে পড়ে। স্বপ্নে সহবাস করার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। সুলোচনা এবং রসবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাঁর চিত্ত ব্যাকুলতার ছবি।

অন্যদিকে রসবতী নাপতেনী সেও বালবিধবা। তার জীবনে প্রেম সম্ভোগ উপভোগ করা হয়নি। তার মনেও সুপ্ত কাম বাসনা রয়েছে কিন্তু বয়সাধিক্যে তা গোপনীয় থেকে গেছে। বিধবারা যে সমাজ অনুশাসনের দ্বারা দলিত তা নাপেতানীর বক্তব্যে সুস্পষ্ট। বিধবারা যেন অদৃষ্টকেও বিশ্বাস করতে চায় না। রসবতী নাপতানীর সাহায্যে মন্মথ ও সুলোচনা একান্তে মিলিত হয়। সুলোচনা আর কলঙ্কের ভয় পায় না। বিধবা হওয়া সত্ত্বেও সুলোচনা মন্মথকে প্রেম নিবেদন স্বরূপ নিজেকে সমর্পণ করার কথা ভাবে। হৃদয়ে যে দাবানল সুলোচনার লেগেছে তা একমাত্র মন্মথর সঙ্গে সঙ্গমেই নিভতে পারে। বৈধব্য যন্ত্রণা এবং যৌবন পিপাসা সুলোচনাকে পদস্খলিত করতে বাধ্য করে। সুলোচনা জানিয়েছে,—

"কূলে দেহ ছাই, মানে কাজ নাই, যদি ওলো পাই
ও মুখ চাঁদে।
আমি হবো তার, যে হবে আমার, প্রণয় কি আর
কলঙ্কে বাদে।।"[১১]

সুলোচনা বিয়ের পর এবং বিধবা হবার পর প্রথম মন্মথকে ভালোবাসে। ভালোবাসা কাকে

বলে তা জানতে পারে। যৌবনের কালপ্রবাহ সুলোচনাকে দগ্ধ করে। মন্মথ সুলোচনার কাছে বিবাহ প্রস্তাব রাখে কিন্তু সুলোচনা তাতে রাজী হয় না। কারণ সে জানে যে তার পিতা বিধবা বিবাহ বিরোধী। তিনি প্রাণ দেবেন কিন্তু বিধবা কন্যার বিবাহ দেবেন না। সুলোচনা তার অদৃষ্টকেও বিশ্বাস করে না। পাছে তার এই সাক্ষাৎটুকুও বন্ধ হয়ে যায়। বিধবা হয়েও যে প্রেমের অঙ্কুর তার মধ্যে সজীবতা এনেছে তা যদি শেষ হয়ে যায়—এই আশঙ্কায় সুলোচনা ভীত হয়ে বিবাহে অস্বীকার করে। মন্মথ ও সুলোচনা পরস্পর অঙ্গুরী বিনিময় করে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে। এতদিন সুলোচনা নিজ বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য রাখেনি। কিন্তু মন্মথের আগমন বার্তা পেয়ে পুণরায় সুলোচনার সাজবার ইচ্ছা জাগে। সুলোচনা আপন মনে নানান চিন্তা করেছে। পূর্বরাগ, অনুরাগের পর মিলনের সময় এসেছে। সুলোচনার মনে প্রেম ভীতি আনন্দ মিলে মিশে একাকার। সে তার প্রণয়ীকে অতি কাছ থেকে হৃদয়াঙ্গম করবে। বিবাহ হওয়ার পর সে যা পায়নি, বিধবা হবার পর যে সামাজিক শৃঙ্খলে যে বদ্ধ, সে আজ গোপন প্রণয়িণী। গোপনে সে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে পাবে। সেই সঙ্গে তার মনে ভয়ও বিদ্যমান। সে মান-মর্যাদার কথা ক্ষণিকের জন্য ভাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র অপর্যাপ্ত আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করে। অধীর আগ্রহের সঙ্গে মন্মথকে আহ্বান জানায় তার কক্ষে। বিস্তর প্রেমালাপের পর, দুজনের বিরহী মন শান্ত হবার পর উভয়েই নিদ্রা যায়।

কিছুদিন পর মন্মথ সুলোচনার কথায় জানতে পারে সুলোচনা গর্ভবতী। সুলোচনা এর বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না। গর্ভধারণ তাঁর কাছে শুধুমাত্র শারিরীক অস্বস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। নাপেতানী রসবতী ও মন্মথ সুলোচনার গর্ভবতী হয়ে পড়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। মন্মথ আত্মগ্লানিতে ভুগতে থাকে। সুলোচনার গর্ভধারণ হয়ে যাওয়ার ফলে মন্মথ ও সুলোচনা দুজনেই আশঙ্কিত হয় লোক জানাজানির ভয়ে।

ক্রমে বৌদি সুখময়ী, সুলোচনার গর্ভধারণ সম্পর্কে জানতে পারে। সুখময়ী তাঁর বিধবা ননদের এই অবস্থার কথা শাশুড়ী পদ্মাবতীকে জানায়। ফলে পদ্মাবতীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। পারিবারিক সম্মান হানি ঘটবে—এসবের চিন্তায় পদ্মাবতী নিজের মৃত্যু কামনা করে। পদ্মাবতী সুলোচনার গর্ভধারণের কথা কীর্ত্তিরামবাবুকে জানায়। কীর্ত্তিরামবাবু এই কথা শোনামাত্র তাঁর বিধবা কন্যার মৃত্যু চেয়েছেন।

বিধবা গর্ভবতী সুলোচনা, আত্মদংশনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প করে। কলঙ্কভারে নিজের জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবে। বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে নিদারুণ কষ্ট এই

কলঙ্ক দাগে। ফলে সুলোচনা মৃত্যুকেই সুখকর বলে মনে করে। সুলোচনার হাতে মন্মথ প্রদত্ত হীরার আংটিটির বিষপানে সুলোচনা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সুলোচনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ায়, তার পিপাসা বাড়ে। সে জল খেতে চায়। পদ্মাবতী নিজ কন্যার প্রাণ রক্ষা করতে চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু সুলোচনা শুধুমাত্র জলের জন্য কাতর হয়ে পড়ে। সুলোচনার জন্য জল আনা হলে সুলোচনা জলের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু সুলোচনার বিধবা বৌদি সুখময়ী তাকে জল খেতে দেয় না। কারণ একাদশীর দিন বিধবা মহিলাদের নির্জলা উপোস চলে। মুখে যদি জল দেওয়া হয়, তবে ইহকালের সঙ্গে পরকালটাও লোপ পাবে। পাপের ভাগী হবে সুলোচনা। সুলোচনার কুকর্মে ইহকাল নষ্ট হয়েছে, শেষে একাদশীর নিয়ম ভাঙলে পরকালটাও খোয়াবে সে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও সুলোচনার শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করা যাবে না শুধুমাত্র একাদশীর জন্য।

বিধবা সুলোচনা সামাজিক বিধিনিষেধের কাছে পরাজিত হয়ে মাতাপিতার আশ্রয়ে শান্তিতে মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু সুলোচনার পিতা কন্যাকে ক্ষমা করতে চাননা। মৃত্যুপথযাত্রী সুলোচনার জন্য ব্যকুল মাতা স্বামীকে বিধবা বিবাহের কারণে ভর্ৎসনা করলে কীর্ত্তিরাম জানিয়েছে এটা তাঁর কন্যার কৃতকর্মের ফল। কন্যার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ বোকামির কাজ বলে কীর্ত্তিরাম মনে করেছেন। বিষ জর্জরিত প্রবল তৃষ্ণায় সুলোচনা প্রাণ ত্যাগ করেছে। সমাজের অনুশাসন তাকে বাঁচতে দেয়নি।

সুলোচনার সাদাকালো জীবন রঙিন হয়ে ওঠার ফলস্বরূপ তাকে পিপাসার্ত ভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে। একাদশীর ব্রতের ফলে পিপাসাও লাঘব করতেও পারেনি সে। একফোঁটা জলে তার পরকালটাও গোল্লায় যাবে, এইভয়ে পরিবারবর্গ তার গলায় জলবিন্দু পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি। জীবনের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি সুলোচনার মত সমাজের বহু বিধবা নারীর জীবন বিপন্ন করেছে। সমাজের রক্তচক্ষু তাদের শাসিয়েছে। ফলে তারা জীবন থেকে বিদায় নেবার জন্য শেষপর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ'* নাটকটি সমকালের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস ও নাটক রচনার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। *'বিধবা বিবাহ'* নাটকটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়িত হয় ও জনসমাদর লাভ করে বিপুলভাবে। *'বিধবা বিবাহ নাটক'* টি (১৮৫৬) ১৮৫৭ সালের মে মাসে শোভাবাজার নাট্যশালায় আশুতোষ দেবের উদ্যোগে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরে এ নাটক ১৮৫৯ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরেজি ২৩শে এপ্রিল) সিঁদুরিয়া পট্টিতে রামগোপাল মল্লিকের

প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটান থিয়েটারে' অভিনীত হয়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন খ্যাতিমান অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নায়িকা সুলোচনার চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই প্রথম মঞ্চাভিনয় শুরু করেন। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের নেতা শ্রীকেশবচন্দ্র সেন এই নাটকটির প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর *'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ গ্রন্থে'* লিখেছেন,—*'' কলিকাতার সিঁদুরিয়া পট্টিতে গোপাললাল মল্লিকের বাড়িতে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে কেশব সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ও প্রযোজনায় উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯, ২৩ শে এপ্রিল।''*[১২]

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের ১৬তম খণ্ডের অন্তর্গত *'রঙ্গালয়'* প্রবন্ধে উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ নাটক'* অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন,—*'' যে সময়ে শর্মিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে ৺কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ও চেষ্টায় সিন্দুরিয়াপটিতে "বিধবা বিবাহ নাটেকর'' অভিনয় করিবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও আখড়াই চলিতেছিল। সিন্দুরিয়াপটির ৺গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে ইহার স্থান হইয়াছিল। কেশব বাবুই এখানকার শিক্ষক। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে [১৮৫৯, ২৩শে এপ্রিল] ইহার প্রথম অভিনয় হয়। অভিনেতৃগণের নাম—*

কৃতিরাম ঘোষ	*মহেন্দ্রনাথ সেন।*
মন্মথ	*প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।*
রামকান্ত	*কৃষ্ণবিহারী সেন।*
গুরুমহাশয়	*হারাণচন্দ্র মজুমদার।*
রামদেব তর্কালঙ্কার	*অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার।*
বর	*যাদবচন্দ্র রায়।*
বিধবাবিবাহের পক্ষীয় ব্যক্তি	*ভোলানাথ চক্রবর্তী।*
সুলোচনা	*বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।*
পদ্মাবতী	*গোপালচন্দ্র সেন।*
সুখময়ীর পুত্রবধু	*নরেন্দ্রনাথ সেন।*
রসবতী নাপেতানী	*রাখালচন্দ্র সেন।*

এই অভিনয়ে তিনজন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত,

ক্ষেত্রমোহন বসু, এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন,—পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণী মাধব সোম। বেলগাছিয়ার অভিনয়ের ন্যায় এই অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।''[১৩]

'*বিধবা বিবাহ নাটক*' অভিনয়ের দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন ইংরেজ শিল্পী হলবাইন। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেন *'বিধবা বিবাহ নাটক'* অভিনয়ের নির্দেশনার তথা '*stage management*' এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অনেক সমালোচক বলেছেন 'বিধবা বিবাহ' নাটকে কেশবচন্দ্র অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। *'বিধবা বিবাহ নাটকে'*র অন্যতম অভিনেতা ও কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,—*"It was a dramatic club to put on the stage Bidhava Bibaha Natak (widow-marriage drama), written with the object of reforming the cruel custom of the forced celibacy of young Hindu widows. (By repeated representations of Hamlet, and other Performances half musical, half dramatic,* ***Keshub had developed such a talent for stage management,*** *that the public in the beginning of 1859, and produced a sensation in Calcutta, which those who witnessed it, can never forget. The pioneer and father of the widow marriage movement Pundit Ishwara Chandra Vidyasagar came more than once, and tender-hearted as he is, was moved to floods of tears. In fact there was scarcely a dry eye in the great audience.. Undoubtedly the most wholesome effect was prodrced. Keshub, as stage-manager, was warmly complimented on his energy and intelligence, and we, his friends, as amateur actors who had done our best, also received our humble share of praise. Though this dramatic success brought Keshub a good deal before the public,...some of the parts played were undoubtedly harmful in their moral tendency; there was in evitable dissipation, frivolity, and a dangerous love of public applause.''*[১৪]

'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয়ের দর্শক ছিলেন সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,—'*great audience*'। বোঝা যায় দর্শকেরা ছিলেন অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ এই নাটকের প্রতিটি অভিনয় রজনীতে উপস্থিত ছিলেন। এ নাটকে সুলোচনার করুণ পরিণতি বিহারীলালের অভিনয়ে এতটাই

সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল, অভিনয় মুগ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। মধুসূদনের চিঠিপত্র সূত্রে জানা যায়, *'বিধবা বিবাহ নাটক'* এর অভিনয় দেখে ইংরেজিতে তিনি নাটকটি অনুবাদের কথা ভেবেছিলেন। বস্তুত বাংলা নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে *'বিধবা বিবাহ নাটকে'*র গুরুত্ব অপরিসীম।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় রাধামাধব মিত্রের *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটক।[১৫] *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকটির দুটি ভাগ। নাটকটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, ১২৬৩ [ইং১৮৫৬] সালের ৮ই পৌষ এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৯ [ইং১৮৫৭] শকাব্দে কলিকাতা হতে। এ নাটকে অঙ্ক বিভাগ, গর্ভাঙ্ক কিংবা দৃশ্যবিভাগ কোনোকিছুর উল্লেখ নেই।

বঙ্গদেশে প্রথম বিধবাবিবাহের পটভূমিকায় শ্রীরাধামাধব মিত্র, *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকটি রচনা করেন। 'বিধবাবিবাহ আইন' পাস হওয়ার কারণে নাটকের মঙ্গলাচরণ অংশে জগদীশ্বরের জয়গান গাওয়ার পর 'শ্রীঈশ্বরোজয়তি' ঈশ্বরকে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন নাট্যকার,—

''মুখে জয় জয় রব, নবীন বিধবা সব,
ঈশ্বরে দিতেছে ধন্যবাদ।''[১৬]

বিধবা রমণীরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন,—'বিধবাতারণ'। বিধবা বিবাহ আইন পাস হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। আর প্রথম বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর। 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হবার, ছ-মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর উদ্যোগ নিয়ে প্রথম বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। পাত্র, সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র শ্রীশচন্দ্র। পাত্রী, বর্ধমান জেলার অধিবাসী পটলডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা। বিবাহের দিন, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ (১২৬৩ সনের, ২৩শে অগ্রহায়ণ)। *'সংবাদ প্রভাকর'* সূত্রে জানা যায় এই বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, ১৫ই অগ্রহায়ণ কিন্তু নানা বাধা বিপত্তিতে শ্রীশচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ২৩শে অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন হিসাবে মনস্থির করেন। *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, এই বিবাহের জন্য ৮০০ নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। প্রচুর লোকসমাগম হলে একরকম পুলিশি নিরাপত্তার ঘোরাটোপে লুকোচুরি করে এই বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। পুরোহিতেরা বিবাহ মন্ত্র পাঠ করে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন করেন। পাত্রীর মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী কন্যা সম্প্রদান করেন। এদেশের হিন্দু বিবাহ রীতি অনুযায়ী, দানসামগ্রী, অলঙ্কার ও স্ত্রী আচার সবই পালিত হয়েছিল। স্ত্রী আচার, উলু ধ্বনি,

বিবাহের রঙ্গরসিকতা—নাকমলা, কানমলা সবই হয়েছিল। এই বিধবা বিবাহে কিছু বিপত্তিও ঘটেছিল। লোকশ্রুতি আছে মনক্ষুণ্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। এরকম লোক অপবাদ রটেছিল সেকালে। '*বিধবা মনোরঞ্জন*' নাটকে এই বাস্তব ঘটনার অনুসৃতি ঘটেছে।

নাটকটির কাহিনীর দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের কাহিনীতে আছে,—রামনিধি ন্যায়রত্নের বিধবা কন্যা কুমুদিনী। ও অন্যদিকে রয়েছে, দুঃখহর ঘোষের বিধবা ভগিনী বিনোদিনী। বিনোদিনী যৌবন জ্বালায় অস্থির। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় বিনোদিনী বিবাহ করতে পারছে না। কুমুদিনীর পিতা কলকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে দান নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে নিজ বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে উৎসাহী হন। বিধবাবিবাহ আইন পাস হবার আগের ঘটনা ও পরের ঘটনা *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকের কাহিনীতে ধৃত হয়েছে। প্রথম ভাগে বিধবা কুমুদিনীর বিধবাবিবাহ উদ্যোগ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে কুমুদিনীর বিবাহ প্রদানের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাগের মূল কাহিনীর সমান্তরালে, একটি উপকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের লক্ষণ অনুসারে ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুসারে, চরিত্রের নামকরণ করছেন নাট্যকার,—বিশ্বনিন্দক মিশ্রি, মিশ্রিদমন, বিশ্বঠক, বিশ্বজয়ী, মহালোভ, পরদ্বেষী, নম্রস্বভাব প্রভৃতি।

নাট্যকার শ্রীরাধামাধব মিত্র, দেখিয়েছেন, —ন্যায়রত্ন প্রথম বিধবাবিবাহের আমন্ত্রণ অনুষ্ঠান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিলাসিনী নামে এক বৈষ্ণবী বিধবা বিবাহে ঘটকীর কাজ করেছেন। পাত্র নিশ্চিন্তপুরের রামেশ্বর তর্কবাগীশের পুত্র চন্দ্রকান্ত। পাত্র রামনিধি ন্যায়রত্নের মনোমত হওয়ায় নির্দিষ্ট দিনে কুমুদিনীর সঙ্গে চন্দ্রকান্তের বিবাহের অপেক্ষায় থেকেছে।

অন্যদিকে, নীলরতন মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁর খুল্লতাত বিধবা বিবাহের বিরোধী। নীলরতন মুখোপাধ্যায় রামনিধি ন্যায়রত্নের বিধবা বিবাহ উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষকে হেয় করেছেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও মানবিক ভাবে বলেছেন,— আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুবতী বিধবা কন্যা যৌবন জ্বালায় অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে গর্ভবতী হবে—ভ্রূণহত্যা করবে কিংবা কুলত্যাগিনী হবে—এতদ্ সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ দেবে না। বিধবা নবৌ বিপত্নীক দুঃখহরকে বিধবা বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেও উচ্চ হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের অনুশাসনে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এ নাটকে অসবর্ণ বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামনিধি ন্যায়রত্ন বিলাসিনী ঘটকীকে

বলেছে,—''*বলে রাড়ের বে তার আর জেতের বিচার কি?...যে জেতে ইচ্ছে সেই জেতে বে হবে সেদিন এখনো হয়নি, ওটা যদি আপাতত চলিত থাক্‌তো তাতেই বা কি হানি ছিল?*''[১৭] অসবর্ণ বিবাহ, কৌলিন্য বিবাহ ও সমাজ অনুশাসনের কারণে ব্রাহ্মণ কন্যা—অকালে বিধবা হয়ে সংসার হতে লাঞ্ছিত হয়ে, সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে, জীবন নির্বাহের জন্য বারবণিতায় পরিণত হয়। কখনও বা দুমুঠো অন্নের জন্য বৈষ্ণবের সেবাদাসীতে পরিণত হয়। যৌবনে যোগিনী হয়ে যান। সেখান থেকে পরিত্যক্ত হলে, ভিক্ষা হয়ে ওঠে তাঁদের জীবন নির্বাহের পথ।

পাত্র দেখতে গিয়ে কানাইলাল পাত্রের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করতে গিয়ে দু'লাইন ইংরেজি কবিতা বলে পাত্রকে বাংলায় তার পদ্যানুবাদ করতে বলেছেন ,—

''*Who takes a widow for his wife.*
Will lead a very happy life''[১৮]

এর উত্তরে পাত্র জানিয়েছে ,— ''*বিধবা নারীকে জায়া করেন যে জন।*
করিবেন সুখে তিনি জীবন যাপন।।''[১৯]

নাট্যকারের এ ধরণের উদ্যেশ্যমূলক শ্লোগানধর্মী সংলাপ রচনা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনের মনোভাবটি স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

মহালোভ ভট্টাচার্য এবং পরদ্বেষী গঙ্গোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচারণের চেষ্টা করেছেন। বোঝা যায়, নাট্যকার সমকালের এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর রক্ষণশীল মানসিকতাকে কটাক্ষ করে, নাম নির্বাচনে 'মহালোভ' ও 'পরদ্বেষী' শব্দবন্ধকে সচেতন ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া নাট্য কাহিনীতে দেখা যায়, 'বিশ্বঠক' ও 'বিশ্বজয়ী' নামক দুই চরিত্রের আগমন, যা ভাবব্যঞ্জনায় ও বক্তব্যপ্রকাশের বিশেষ ইঙ্গিতবাহী।

রামনিধি ন্যায়রত্ন, মহালোভ ভট্টাচার্য ও পরদ্বেষী গঙ্গোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণকে আমল না দিয়ে 'বিধবা বিবাহ' অনুষ্ঠানের কাজে অগ্রসর হয়েছেন। রামনিধি ন্যায়রত্ন তাঁর ভাগ্নেকে দিয়ে মহালোভ ভট্টাচার্যকে কুড়ি টাকা উপঢৌকন দিলে, মহালোভ ভট্টাচার্য বিধবা বিবাহের পক্ষে অগ্রসর হন। বিধবাবিবাহ ও রামনিধি ন্যায়রত্নের প্রতি মহালোভ ভট্টাচার্যের বিরূপ মনোভাব ছিল প্রথম থেকে। কিন্তু কুড়ি টাকা পাওয়ার পর মহালোভ ভট্টাচার্যের এই মত পরিবর্তনকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজ জাতধর্ম-কৌলিন্য ধর্ম- নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন,

— ''*ফলারে নিপুণ, ফলারে বামুন,*
হেথা বোসে কেন আর।

নিলে যার ধন, ত্বরায় এখন,

গিয়া গাও যশ তার।।"[২০]

পরদ্বেষী গঙ্গোপাধ্যায় নিজের জাতকৌলিন্য নিয়ে গর্ব করলে মহালোভ জানিয়েছে,—"*তার রাঁড় মেয়ের বে দেবে শুনে চমকে উট্‌চো, তোমাদের মেয়েদের কি হয়, তা জাননা বুজি? কারো রোজ রোজ যে বে হয়...?*"[২১]এর প্রতি উত্তরে মহালোভ ভট্টাচার্য কুলীনদের কুলের কথা, অনাচারের কথা বলেছেন। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অর্থলোভ কি প্রকার ছিল নাট্যকার তা ব্যক্ত করেছেন মহালোভ ও পরদ্বেষী চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে।

'বিধবা মনোরঞ্জন' নাটকে নাট্যকার বিধবা বিবাহকে —হিন্দুর নব বিবাহের মতই চিত্রিত করেছেন। উনিশ শতকে বিধবাবিবাহ আইন চালু হলে, প্রত্যক্ষত বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হত লুকিয়ে চুরিয়ে গোপনে এবং বেশ কিছু বিবাহ আচারকে পরিত্যাগ করে সংক্ষেপে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহকে, প্রথম নব বিবাহের মতই নাট্যকাহিনীতে উপস্থিত করেছেন। আর সেকারণে, দেখা যায় বিধবার এই পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠানে বিধবা নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে বিধবাদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। পাছে কন্যা বিধবা হয়। এই আশংকায় বিধবাদের বিবাহ আচার থেকে দূরে রাখা হয়। নাট্যকাহিনীতে দেখা যায়, পদ্মিনী শুদ্ধ বরণডালা আনতে আনতে পড়ে গেলে বরণ ডালা বিগড়ে যায়, বড় গিন্নিকে তা সোজা করতে বলায় সে বিধবা হওয়ার কারণে আপত্তি জানায়। বিশ্বনিন্দক মিশ্রি নামে জনৈক বরযাত্রী এবং মিশ্রিদমন নামে জনৈক কন্যাপক্ষের বিবাদও সামাজিক বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে এ নাটকে। বাসরঘরে বড় গিন্নি, রসিকা, পদ্মিনী, হেমলতা প্রমুখের স্ত্রীআচার ও রসিকতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেকালের এক বিশেষ সমাজচিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকের উপকাহিনীতে দুঃখহরের বোন বিনোদিনী ও বিধবা নবৌয়ের বিবাহের উদ্যোগের উপস্থাপনা করেছেন নাট্যকার।

দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় বিধবা নবৌকে, বিপত্নীক দুঃখহর বিবাহ করতে অস্বীকার করলে নবৌ হতাশ হয়ে পড়ে এবং জীবন সঙ্গীর অপেক্ষায় দিনাতিপাত করে। নাটকের দ্বিতীয় ভাগে, দেখা যায়, দুঃখহরের বিধবা বোন বিনোদিনী—নবৌ ও বিপত্নীক ভ্রাতা দুঃখহর-এর পারস্পরিক অনুরাগ নিয়ে যে রসিকতা করেছে তা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্লীল মনে হতে পারে। উনিশ শতকে মেয়েলি অন্তঃ পুরে এ ধরণের রসিকতা শোনা যায়। বিশ্বজয়ী ও বিশ্বঠক নামে দুই ঘটকের ভণ্ডামি ও কলহে সেকালের ঘটকদের কীর্তিকলাপ ধরা পড়েছে।

বিলাসিনীর দ্বারা কুমুদিনী ও চন্দ্রকান্তের পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, প্রেম ও সবশেষে বিধবা বিবাহ দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার বিধবা বিবাহ সফল করার পূর্বে রোমান্টিক প্রেমের আয়োজন ঘটিয়ে মূল উদ্দেশ্য নির্বাহ করেছেন। কুমুদিনীকে শিক্ষিত প্রতিপন্ন করেছেন নাট্যকার। তাঁকে দিয়ে নাট্যকার পত্র লিখিয়েছেন। বিলাসিনীকে দিয়ে সে চিঠি চন্দ্রকান্তকে পাঠানো হয়েছে। প্রথম বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নমুনা এ নাটকে ব্যবহৃত হলেও বর, কন্য প্রমুখের নাম গোপন করে অন্যভাবে বলা হয়েছে।

'বিধবা মনোরঞ্জন' নাটক রচনায় নাট্যকার নাট্যগ্রন্থনায় সংস্কৃত নাট্যরীতি ও প্রাচীন যাত্রানাট্য রচনার কৌশল অবলম্বন করেছেন। মঙ্গলাচরণ, গদ্যসংলাপ ও পদ্যসংলাপ বিপরীত ক্রমে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। নাটকে গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ না করলেও কাহিনীর ঘটনাস্থল নির্দেশ করেছেন নাট্যকার। নাট্যকার কাহিনীর ঘটনাস্থল সম্পর্কে লিখেছেন,—'কলকাতার সন্নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম', 'রামনিধি ন্যায়রত্নের বাটী', 'অন্য পাড়ার ঘোষেদের বাটী', 'নিশ্চিন্তপুরে রামেশ্বর তর্কবাগীশের বাটী সংযোগস্থল' প্রভৃতি। নাট্যকার কাহিনী পরম্পরায় স্থানগত ঐক্যকে মান্য করেছেন।

রাধামাধব মিত্র নাট্যকার হলেও ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট কবি। তাঁর পাঁচ খণ্ডে রচিত *'কবিতাবলী'*[২২] প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। তাঁর কবি মানসিকতার অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নাটকে। এ নাটকের সংলাপ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। গদ্য সংলাপে চলিত ভাষা এবং পদ্য সংলাপে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। ন্যায়রত্ন, নীলরতন, কুমুদিনী, বিনোদিনী, পদ্মমুখী, নবৌ, দুঃখহর, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি সংলাপ,— গদ্য ও পদ্য সংলাপ ও সাধু-চলিতের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মহালোভের কোন কোন সংলাপে আলংকারিক ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

'বিধবা মনোরঞ্জন' নাটকের নায়িকা কুমুদিনী এবং নায়ক চন্দ্রকান্ত। তবে, কুমুদিনীকে যতটা সক্রিয় ভাবে নাট্যকার অঙ্কন করেছেন, চন্দ্রকান্তকে ঠিক ততটাই উপেক্ষা করেছেন। নাটকে তাঁকে রোমান্টিক নায়করূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নবৌ, বিনোদিনী, ব্রাহ্মণী, বিলাসিনী, বড়গিন্নি প্রভৃতি পার্শ্ব চরিত্রগুলি নাট্যকাহিনীকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। মণি দাসী, ভৃত্য রামধন, কানাইলাল, বনমালী, বিশ্বজয়ী, রসিকা, হেমলতা, নলিনী, পদ্মিনী, মহালোভ, পরদ্বেষী, নম্রস্বভাব, বিশ্বনিন্দক মিশ্রি, মিশ্রিদমন, নরসুন্দর, সুচতুর জনতা চরিত্রের মতই নাটকের কাহিনীকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। কুমুদিনী আনন্দে চন্দ্রলোকের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। নায়িকা কুমুদিনীও

চন্দ্রকান্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখী হোক এই কামনা করেছেন নাট্যকার। বিধবা কুমুদিনীর মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নাট্যকার *'বিধবা মনোরঞ্জন'* নামকরণ করেছেন। বিধবা নবৌ এবং বিধবা বিনোদিনীর বিবাহ প্রদান না করতে পারলেও নাট্যকাহিনী বিশেষ মনোরঞ্জক। সেদিক থেকে নাটকের নামকরণ *'বিধবা মনোরঞ্জন'* সার্থক।

১৮৫৬ সালের ২০ শে আগষ্ট প্রকাশিত হয় অজ্ঞাতনামা রচিত *'বিধবা বিষম বিপদ'* নাটক। অজ্ঞাতনামা রচিত *'বিধবা বিষম বিপদ'* নাটকটি প্রকাশের সংবাদ *'সংবাদ ভাস্কর'* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে,—''*...কয়েকদিবস গত হইল, "বিধবা বিষম বিপদ'' নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি, তাহাও বিধবা বিবাহোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে...।*''[২৩] বিধবা বিবাহ আইন পাস হবার পরবর্তী 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক' নাটকগুলি র মধ্যে *'বিধবা বিষম বিপদ'* নাটকটিকে প্রথম বলে মনে করেছেন নাট্য সমালোচক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

'বিধবা বিষম বিপদ' নাটকে মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়—এই দুই কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা বিবাহ নিয়ে ভিন্ন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ কুলীন পাত্রের সঙ্গে তাঁর তিন কন্যার বিবাহ দিলে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাত্রের মৃত্যু হয় এবং তিন কন্যা বিধবা হয়। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত হওয়ায়, চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিধবা কন্যাদের পুনর্বিবাহ দিতে চান। অন্যদিকে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের দুই কন্যাও বিধবা। কিন্তু তিনি বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। তাঁর এক কন্যা প্রসন্নময়ী অবৈধ প্রণয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ফলে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের সামাজিক সম্মান ধুলিসাৎ হয়ে যায়। মুখোপাধ্যায় তাঁর যুবতী কন্যা বিধবা প্রসন্নের গর্ভনাশ ও জাতির ভয়ে পাপ ঢাকতে ভদ্রাসন খোয়াতে বাধ্য হয়।

'বিধবা বিষম বিপদ' নাটকে মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা প্রসন্ন, পাড়ার চৌকিদারের সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত হয়। গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাঁর পিতা-মাতা অন্তঃপুরে এক স্ত্রীলোকের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটায়। এ ঘটনা জমাদারের কাছে প্রকাশ পায়। ক্রমে লোক জানাজানি হয়ে যায়। জমাদারকে ষাট টাকা ঘুষ দিয়ে এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঙ্গুলি, ঘোষাল প্রমুখ সমাজপতিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে কোনো ক্রমে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু জমাদারের উৎকোচ প্রদান সমাজপতিদের ভোজের আয়োজন করতে নিজ বসতবাটি বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। বস্তুত নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন, যুবতী বিধবা ঘরে থাকলে ব্যভিচার ও অবৈধ গর্ভপাত ঘটতে পারে। *'বিধবা বিষম বিপদ'*[২৪] নাটকে পাঠককে নাট্যকার বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করাতে চেয়েছেন। নাট্যকার আরও জানিয়েছেন, বিধবা কন্যা বাড়িতে থাকলে নীচ জাতির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত

হয়ে সমগ্র পরিবারকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দিতে পারে। অতএব বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ দেওয়া উচিত।

পূর্ববর্তী উমেশচন্দ্র মিত্রের *'বিধবা বিবাহ নাটকে'* (১৮৫৬) দেখা গিয়েছে কায়স্থ পরিবারের বিধবা নারীর সংকটময় ছবি। পদবী হিসাবে কায়স্থকুলের ঘোষ, বসু, মিত্র পরিবারের ছবি অঙ্কন করেছেন নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র। *'বিধবা বিষম বিপদ'* নাটকে (১৮৫৬) নাট্যকার একধাপ অগ্রসর হয়ে সমাজের প্রধান প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবার চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের বিধবার সংকটময় ছবিকে তুলে ধরেছেন। বস্তুত নাট্যকার *'বিধবা বিষম বিপদ নাটকে'* কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে নাট্যকাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে।

'পদ্যপাঠ' গ্রন্থের বিশিষ্ট কবি হিসাবে সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিলেন যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের *'চপলাচিত্তচাপল্য'* নাটক। বিধবা বিবাহের সমর্থনে উদ্যেশ্যমূলক ভাবে এ নাটক রচিত। *'চপলাচিত্তচাপল্য'* ছয় অঙ্কে বিন্যস্ত স্ত্রীচরিত্র প্রধান নাটক। নাটকের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে আটজন পুরুষ ও এগারোজন স্ত্রী চরিত্রের অবতারণা রয়েছে। বিধবা চপলার চিত্তের অস্থিরতা ও চপলমতিত্ব এ নাটকের বিষয়। বৈধব্য জীবনের দুঃখ অপেক্ষা এ নাটকে বিধবা চপলার অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে কাব্যিক ভঙ্গিমায়। *'চপলাচিত্তচাপল্য'* নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন,—*"বিধবা বিবাহ নির্বাহ হইবার পূর্বেই ইহার লেখা শেষ হইয়াছিল, কিন্তু কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতাবশতঃ একাল পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। যদিও এখন ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কিছু পরিবর্তন না করিয়া প্রথমে যেরূপ লেখা ছিল সেইরূপ প্রকাশিত হইল।...এমত অবস্থাও (অসংলগ্ন অবস্থা) ইহার যা উদ্দেশ্য বোধহয় তাহা সাধন করিতে পারিবে, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্বক সকলে এক একবার পাঠ করিলে আমার মানস সফল হইবে।"*[২৫]

জমিদার বাসব রায়ের কন্যা চপলার বৈধব্যের সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর শুরু। আলোচ্য নাটকের কাহিনীতে রয়েছে,—জমিদার বাসব রায়ের বালিকা কন্যা চপলার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসে। সদ্য বাল বিধবা চপলার পুনর্জনমের সুখী দাম্পত্যের কথা ভেবে তর্কালঙ্কার পরামর্শ দেন জমিদার বাসব রায়কে,—এখন ব্রতাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা চপলার পুণ্যসঞ্চয় করান, যাতে সে পুনর্জন্মে সুখী এবং দীর্ঘকাল সধবা থাকতে পারে। বাসবের স্ত্রী মা হয়ে মেয়ের একাদশী পালনের কথা ভেবে শিহরিত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, চপলা একাদশী করবে,

একসন্ধ্যে আলোচাল খাবে আর তিনি কেমন করে সব ভালো খাবার খাবেন,— ''*পোড়া শাস্ত্র ত এমন নয় যে কিছুকাল একাদশী না কল্লে রেত পাবে।*''[২৬] চপলার মা চিন্তিত হয়েছেন স্বামী বাসবের জন্য। কারণ,—''*সত্যই বাল-বিধবার পিতাকে অসুখী থাকতে হয়। কারণ বয়ঃদোষে কলঙ্কের নিশান তারা তুলে ধরতে পারে।*''[২৭] চপলাকে প্রথম কিছুদিন বিধবা হওয়ার খবর জানানো হয়নি। প্রতিবেশীদের মুখ চেয়ে অবশেষে তাঁকে বৈধব্যের সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিধবার বৈধব্য আচার ও ব্রহ্মচর্য পালনের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ তা ভিত্তিহীন। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনে অল্পবয়সী বিধবার কোনো আন্তরিক প্রেরণা থাকে না। বিধবা বিনোদার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সে অশ্রদ্ধার কথা,—''*সত্তি বল্‌তে কি, এখন আমাদের পূজো করবার বয়েস হয়নি, মনই স্থির থাকে না, কতদিকে যায়। তবে না কল্লে লোকে নিন্দে কর্ব্বে, আর গুরুপুরুত দেখা হলেই, আশীর্ব্বাদ করেন। "ধর্ম্মে মতি হোক'' তাই বোন্ ধর্ম্ম করি।*''[২৮] বোঝা যায় অকাল বৈধব্য ও তার ধর্ম্মাচরণ কি প্রকার অন্তঃসারশূন্য।

ঘটনাক্রমে কৃষ্ণকথা শুনতে এসে চারু—চপলাকে দেখে প্রেমে পড়ে ও পূর্বরাগে আকৃষ্ট হয়। চপলার মধ্যে দেখা দিয়েছে চিত্ত চাঞ্চল্য। মালিনী দুটো পয়সার লোভে চারু ও চপলার মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে। বিয়ের তিন দিন আগে জমিদার বাসব দেওয়ান, রাঘব মজুমদার ও পুরোহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নিজ কন্যার বিধবা বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। তর্কালঙ্কার অবাক হয়ে গেছেন এই কথা শুনে। তর্কালঙ্কার জানিয়েছেন—বাসব ও ভূদেব দুজনেই পণ্ডিত, হিন্দুধর্মের লোক এবং সু-ব্রাহ্মণ—তবু কেন তাদের এ দুর্মতি হল! বাধ্য হয়ে তাঁরা বিবাহের পত্র বিলির জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। বিয়ের দিন চারুকে বর হিসাবে দেখে চপলা অবাক হয়ে গেছে। সখী কামিনীর কাছে চপলা তার পূর্বরাগের ইতিহাস ব্যক্ত করেছে।

চারিদিকে যখন বিধবা বিবাহ নিয়ে নানা চর্চা শুরু হয়েছে, বিধবা কন্যার পিতা হিসাবে জমিদার বাসব রায় অনুভব করেছেন বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা। জমিদার বাসব রায় তাঁর বিধবা কন্যার একদশী পালনকে যেমন সহজ সাধ্য করে দিয়েছেন, তেমনি কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়ে বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করার জন্য সংকল্প নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি চপলার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। যদিও বাসব রায় গোপনে তাঁর কন্যার বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছেন।

নাট্যকার যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এ নাটকে বর্ণকৌলিন্য ও অর্থকৌলিন্যের সমান্তরাল ছবি নির্মাণ করেছেন। অর্থকৌলিন্যে গরীয়ান ঘরের বিধবার জন্য একাদশীর উপবাস অনেক

শিথিল। অন্যদিকে দরিদ্র ঘরের বিধবার বৈধব্য আচার অনেক কঠোর, অনেক হৃদয়হীন। এ নাটকে দেখা যায়, অর্থকৌলিন্যের গরবে গরবিনী হয়ে জমিদার-কন্যা চপলা বিধবা হয়েও রাঙাপাড় শাড়ী পরেছে, গয়না পরেছে। অন্যদিকে চপলার সমবয়সী অন্যান্য বিধবারা সাধারণ বৈধব্য সংস্কারের ব্রত যন্ত্রে ও আচার সর্বস্বতায় দগ্ধে মরেছে।

জমিদার বাসবের দেখাদেখি, প্রতিবেশী সুদেব, সুবর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সুদেব চপলার পুনর্বিবাহের পাত্র হিসাবে ভূদেববাবুর পুত্র চারু প্রস্তাব দিয়েছেন। কথাবার্তায় ভূদেবও রাজী হয়েছেন পুত্রের বিয়ে দিতে। ভূদেবের মত— গাঁয়ের লোক জমিদার বাসবকে যদি সমাজ একঘরে না করতে পারে, তাহলে তাকেও পারবে না। এভাবেই বিধবা বিবাহের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনীর ইতি টেনেছেন।

বিদ্যসাগর তাঁর *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব'* ২য় পুস্তকে লিখেছেন—*''হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।...বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্‌ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয় নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই*

প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।''[২৯]

'*চপলাচিত্তচাপল্য*' নাটকটির প্রশংসা করে সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন,—''*বিধবা বিবাহ নাটক' করুণরসে সমাজের পাষাণ-হৃদয় গলাইতে চাহিল। 'চপলাচিত্তচাপল্যে'র মধ্যে লেখক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমস্যার উপর একেবারে যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। দুঃসাহস বটে, পঁচাত্তর বৎসর পরে শরৎচন্দ্রও এতখানি সাহস দেখাইতে পারেন নাই।*''[৩০]

আবার সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর *'দৃশ্যকাব্য পরিচয়'* গ্রন্থে এ নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সমালোচনায় লিখেছেন,—''*চপলাচিত্তচাপল্য' নামেমাত্র নাটক, পদ্যরচয়িতার হাতে পড়িয়া ইহার নাট্যশক্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় স্বয়ং বলিয়াছেন যে, 'ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্ন'। নাটকের দৃশ্যগুলি পরম্পরাপেক্ষা না হইয়া পৃথক পৃথক চিত্রের ন্যায় দেখাইয়াছিল। ইহা নাটক রচনার রীতি নহে, এবং স্থানে অস্থানে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কবিতার প্রয়োগে নাটকটি ভারাক্রান্ত হইয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়া ছিল। ইহার অভিনয়ের কোন খবর আসে নাই।*''[৩১] *'চপলাচিত্তচাপল্য'* নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা স্থূলতা তৎকালীন অন্তঃপুরের নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জীবন্ত ভাবে প্রকাশ করেছে নাট্যকার। বস্তুত উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজ চিত্র এ নাটকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় বিহারীলাল নন্দীর '*বিধবা পরিণয়োৎসব*' ও গুণাভিরাম শর্মার '*রামনবমী*' নাটক। বিধবা বিবাহের সমর্থনে '*বিধবা পরিণয়োৎসব*' নাটকটি রচিত হয়। সমালোচক প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত লিখেছেন,— ''*বিধবা বিবাহ বিষয়ক আরও কয়েকখানি প্রহসন নাট্যের নাম উল্লেখযোগ্য—রাধারমণ মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন', বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা পরিণয়োৎসব', যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিলাস' উল্লেখযোগ্য।*''[৩২] *'বিধবা পরিণয়োৎসব'* নাটকের নাম শুনে বোঝা যায়, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ পরবর্তীকালীন উৎসবমুখর সুখচ্ছবির ইঙ্গিত আছে । অনেক অনুসন্ধান করেও এ নাটকটি আমাদের হাতে আসেনি।

অসমীয়া লেখক গুণাভিরাম শর্ম্মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম স্নেহভাজন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তিনি। গুণাভিরাম শর্ম্মা কলকাতায় পড়াশুনা করা অবস্থায় ১৮৫৭ সালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে *'রামনবমী'* নাটকটি রচনা করেন। সমকালে নাটকটি 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর চাকরিসূত্রে ১৮৬৭ সালে গুণাভিরাম

আসামের নগাঁওএ চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দেবীর ইচ্ছা ছিল '*রামনবমী*' নাটকটি অসমীয়া ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোক। কিছুকাল পর তাঁর স্ত্রীর প্রয়াণ ঘটে। এরপর অল্প কিছু অদলবদল করে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত *'রামনবমী'* নাটকটিকে গোয়ালপাড়া আসাম থেকে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশ করেন। '*রামনবমী*' নাটকের ভূমিকায় গুণাভিরাম শর্ম্মা লিখেছেন,—''*ইংরাজী ১৮৫৭ সনত মঘ যেতিয়া, কলিকাতার পরা আপোন মাতৃ ভূমিলৈ আহোঁ বাটত এই রামনবমী নাটক খানি রচনা করিছিলো। পাছত সময়ে সময়ে অরুণোদয় সম্বাদ পত্রতই মুদ্রিত হইছিল।*''[৩৩] *'রামনবমী'* পঞ্চাঙ্ক নাটক। এ নাটকের কাহিনী বৃত্তান্তে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহের অনুসঙ্গ। কামদেব ও রামচন্দ্র সমাজে হিন্দু বিধবা নারীর গোপন সহবাস নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তায় উঠে এসেছে বিধবা নারীর গোপন সহবাস যাপনের চিত্র,—

''রাম ।। দেশাচার! ইঃ দেশাচার!...বিশেষ বিধবা বিলাকে তলে তলে ছল লই লই বহু পুরুষে সইতে সহবাস করা, ভ্রুণ হত্যা করা কেনে পাপ। তাতকৈ এজনর যেনে ভাবে পাণীগ্রহণ বর আবশ্যক আরু তার পরা বহু উপকার আছে। পাপ নীচেই নাই।

কাম ।। তেনে হনে ভার্য্যা স্বামীর স্নেহ কমিব।

রাম।। ...এতেকে বিধবার বিবাহ হলে সেই সকলোরো দুয়ারত হেঙ্গার বান্ধা হয়। বিধবা বিলাকর দুঃখর কথা স্মরণ করিলে আরু দেখিলে শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।''[৩৪]

মূলত নবমী নামক এক যুবতী বিধবার অবৈধ প্রণয় বৃত্তান্ত ও বিধবা সংকটের ছবি উঠে এসেছে 'রামনবমী' নাটকে। অবৈধ ভাবে মেলামেশায় নবমী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সমাজ কলঙ্কের ভয়ে নবমী বিচলিত ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত নবমী তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি উদ্দেশ্য করে স্বগতোক্তিতে জানিয়েছে,—'' *(একাকিনী)...প্রথমে যাত বিয়া দিছিল তেঁওর মৃত্যুর জন্য মোর যি ক্লেশ তার কষ্ট, স্বভাবর সক্তি অতিক্রমণ করিব নোয়ারি ময় করা কর্ম্মর কষ্ট, লোকত লজ্জা ভয় আরু অপমান।...আহা! মোর বৈধব্য দশা। ময়েই যদি বিধবা নহম এনে হব কিম? নয়তো এই প্রাণ সাথে সইতে সংঘটন হবর পরা বিধবা নহঁও।...(গর্ভস্থ সন্তানর প্রতি) হে জিব! তুমি মোর উদরত উৎপত্তি হই সংসার নেদেখিলাই? কিমান মানুহে সন্তানর জন্য যাগ যজ্ঞ তপ জপ করিছে, ময় সেই সন্তান ধর্ম্মতঃ আরু ন্যায় পক্ষে পাইও নষ্ট করিব লগিয়া হলোঁ। আহা! দেশাচারর কেনে দারুণ শাসন। হে গর্ভস্থ সন্তান!*''[৩৫]

'রামনবমী' নাটকের অন্তিমে পুরোহিতের উক্তিতে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে নাট্যকার এক দীর্ঘ কবিতা সংযোজন করেছেন। যেখানে নাট্যকারের বিধবা বিবাহ

সমর্থনের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে,—

''বিধবা নারীর পতি সঙ্গ, ঈশ্বরর ইচ্ছা মোহে যদি,
কামভাব তার নথাকিত অঙ্গ ভরি।।
যি কারণে সিতো মোহে নাশ, স্বভাবর গতি অপ্রযাস,
সুযোগত হয় প্রকাশ অজস্র মতে।
কলি শাস্ত্র কর্ত্তা পরাশরে, কহিছে স্মৃতিত উচ্চৈঃস্বরে।।
বিধবা নারীর পতিরন্যো বিধিয়তে।
হেনয় শাস্ত্রক পরিহরি, মিছা আচারক সত্য করি,
কিনো অষুগুত আচরিছা দৃঢ় করি।
দেশাচার যাক ভাবি আছা, তার পরিবর্ত্ত জানা সঁছা,
তথাপিতো তাক স্থির বুলি আছা ধরি।।
ভ্রুণহত্যা ব্যভিচার দোষ, গুপুত প্রেমর অসন্তোষ,
আরু নানা পাপ সকলো হইব নিঃশেষ।''[৩৬]

উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে সমীহ করতেন। জয়কৃষ্ণ ছিলেন, বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তারকচন্দ্র চূড়ামণি '*সপত্নী*' (১৮৫৮) নাটক রচনা করেন। '*সপত্নী*' নাটকের ভূমিকায় তারকচন্দ্র চূড়ামণি লিখেছেন,—''*'সপত্নী নাটক, প্রথম ভাগ, জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আদেশে, তারকচন্দ্র চূড়ামণি প্রণীত, কলিকাতা, ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪।'*[৩৭] বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের সমালোচনা করেই 'সপত্নী'নাটক রচিত। '*সপত্নী*' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার সেকথা উল্লেখ করেছেন,—''*বর্তমানকালে, বাঙ্গালাদেশ যে সকল কদাচার কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষতঃ বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই, এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য।*''[৩৮]

নাট্যকার তারকনাথ চূড়ামণি '*সপত্নী*' নাটকে দেখিয়েছেন, ভূধর-সৌদামিনী ও ব্রজবিলাস-মোহিনীর নিতান্ত বাল্য বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহের কারণেই তারা অসুখী। বাল্যকালে বিবাহ করা স্ত্রীকে যৌবনে আর ভালো না লাগায় ব্রজবিলাস ও ভূধরের দ্বিতীয়

বিবাহের কথা উঠে এসেছে। সপত্নী নাটকে রামব্রহ্ম একশত বিয়ে করেছেন। আবার, সপত্নী নাটকে বহুবিবাহকারী অসচ্ছল কুলীনের সাক্ষাৎ পওয়া যায়, কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা এই তিন বোনের স্বামী ৪৯টি বিবাহ করেছেন কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল। অর্থসংকটে পড়ে কুলীন ব্রাহ্মণ ডাকাত দলে যোগ দেয়, ধরা পড়ে, জেলে যায়। স্বামী বিরহিণা তিন যুবতী বোন কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা, জৈবিক তাড়নায় আত্মসংযমে অক্ষম হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রিত কামদেব নামক এক যুবকের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই তিন কন্যার মা হরমোহিনী এবং পিতা রামাকান্ত এই ব্যভিচার সম্পর্কে সব জেওে বাধা দিতে পারেনি। এসব কুলীন ব্যভিচারনী স্ত্রীর সন্তান হত না। বোঝা যায়, ভ্রুণহত্যাই ছিল তাদের পথ।

বহুবিবাহের কুফল নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন সমাজ আন্দোলন 'বিধবার পুনর্বিবাহ' প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছিল বিধবার সংকট ও সমস্যা। আর সেকারণেই নাট্যকার বহুবিবাহের কুফল নিয়ে বলতে গিয়ে বিধবা সংকট ও বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনকে নাট্যদৃশ্যে তুলে ধরেছেন। '*সপত্নী*' (১৮৫৮) নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সূর্য্যকান্ত ও রামগতির তর্কাতর্কি সংলাপে উঠে এসেছে ১৮৫৬ পরবর্তীকালীন সময়ের বিধবা বিবাহ আইন পাস হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের বিষয়। সমকালীন সমাজ ইতিহাসের ছবিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার,—

''*সূর্য্যকান্ত ।।* *...দেশে আর কি বিচার আছে? না, আচার আছে? দেশটা এককালে খ্রিষ্টান হইয়া উঠিল বৈ তো নয়?*

রামগতি।। *(হাসিতে হাসিতে) কেন মহাশয়? দেশ খ্রীষ্টীয়ান কিসে হইল?*

সূর্য্যকান্ত (সদম্ভে)।। *আবার জিজ্ঞেস করিতেছ হে? রাঁড়ের বিবাহ হইতে চলিল? যাহা কর্ণেও শুনি নাই। বেদে নেই; পুরাণে নেই; কোরাণেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না? আরও কি দেশে মানুষ আছে বল?*

রামগতি।। *কেন মহাশয়! এই যে বিদ্যাসাগর মহা--।*

সূর্য্যকান্ত । *(রামগতির কথা শেষ না হইতে হইতেই সক্রোধে) আঃ যাও যাও! ওটার আর নাম করিও না। শুনিলে রাগ জন্মে।*

রামগতি।। *সে কি মহাশয়। এ কি বলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় লোক, তাঁহার নাম শুনিলে আবার আপনকার রাগ হয়? সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়*

না? আর দেশে লোক নাই বলেন কি? তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে প্রথম ব্যবস্থা বাহির করেন, তখন নবদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া ছিলেন এবং কত শত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন একথা সত্য কি না?

সূর্য্যকান্ত।। হাঁ হাঁ! তা সত্য বটে!...

রামগতি ।।...এক্ষণে বলুন দেখি আপনি যাঁহাদিগকে মানুষ ও হিন্দু স্থির করিয়াছেন, ইহাদের প্রতি আপনকার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে কি না?

সূর্য্যকান্ত ।।(দম্ভে, প্রফুল্ল বদনে)। হাঁ আন্তরিক আস্থা আছে বৈ কি?

রামগতি।। আচ্ছা, মহাশয়! এখন বলুন দেখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত প্রথম ব্যবস্থাপত্রে ইঁহারা যে দোষোল্লাস করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র দ্বারা তিনি তাহা তন্ন তন্ন রূপে খণ্ডন করিয়া দিলে তাহাতে আর কি কেউ কোন উত্তর করিতে পারিয়াছিলেন।

সূর্য্যকান্ত।।(বিরাগে) যাও যাও। আর তোমাদের ও সকল খিষ্টানী কথা শুনিতে চাই না।'[৩৯]

বস্তুত নাট্যকার সমকালীন সমাজ মানসিকতার গোটা চিত্রটাই এখানে তুলে ধরেছেন। এছাড়া নাট্যকার আরও দেখিয়েছেন, বহুবিবাহ হোক আর বিধবা বিবাহ হোক—পুনর্বিবাহের অনুষ্ঠানে থাকত কামিনী বিলাস ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের সামাজিক কদাচারকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাঁর *'সপত্নী'* নাটকে।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের *'বিধবা বিবাহ বিষম দায়'* নাটক। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজপুর হরিণাভীতে বাস করতেন। তিনি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রতিবেশী ছিলেন। ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫১ এই সময়কালে তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫১ থেকে ১৮৮২ এই সময়পর্বে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ছিলেন জাতিভেদ বিরোধী, উদারমনস্ক মানুষ। 'সংস্কৃত যন্ত্র' প্রেস স্থাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র', 'গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্র', 'গিরিশ যন্ত্র' প্রভৃতি প্রেস স্থাপন করেন হরিণাভীতে।[৪০] তৎকালীন সামাজিক অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করে গিরিশচন্দ্র

বিদ্যারত্ন '*বিধবা বিবাহ বিষম দায়*' (১৮৫৮) নাটক রচনা করেন। এ নাটক রচনার জন্য সেকালে তাঁকে নানান সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। '*বিধবা বিবাহ বিষম দায়*' অধুনা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ নাটকের কাহিনী সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী ও মঞ্চসফল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। বাংলা সামাজিক নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্র পথিকৃৎ। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের *'নীলদর্পণ'* নাটক। *'নীলদর্পণ'* নাটকে নীলকরদের অত্যাচার বর্ণনার পাশাপাশি, প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ। আদুরী *'নীলদর্পণ'* নাটকের বিধবা চরিত্র। বসু পরিবারের দীর্ঘদিনের পুরাতন ঝি। আদুরীর স্বভাব পরিহাসপ্রিয়তা। তার হাস্য পরিহাসময় রঙ্গ রসরসিকতার মধ্যে উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রদানের প্রসঙ্গ। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আদুরীর মনে জেগেছে এক অপার কৌতূহল। সৈরিন্ধীর কাছে বিদ্যাসাগরের নাম শুনে আদুরী জানিয়েছে,—

''সৈরিন্ধ্রী।। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করে্য) ছোট বউ বসিস্, আমি আস্চি, ,বিদ্যা সাগরের বেতাল শুনবো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

আদুরী।। সেই সাগর, নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটোদল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সরলতা ।। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্ তো?

আদুরী।। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্ নে। মিনসের মুখ্খান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্রে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্ তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো। পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এতভারি। মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি। দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বলতো, "ও পরাণ, ঘুমুলে।''

সরলতা ।। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্তিস!

আদুরী।। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সরলতা ।। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস্?

আদুরী।। মুই বল্তাম, হ্যাদে ওয়ো শোনচো...''[৪১]

—আদুরীর এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে তার অতৃপ্ত জীবন তৃষ্ণাই প্রকাশিত হয়েছে। সুখের দাম্পত্য জীবনে সে একদিন অধিষ্ঠিত ছিল। সে সুখ তার ভাগ্যে বেশিদিন টেকেনি। প্রাণের

সাধ-আহ্লাদ না মিটতেই সে স্বামীহারা হয়। ফলে তার সুখ গেছে, কিন্তু মনে রয়েছে সুখের স্মৃতি ও বাসনা। বর্তমান জীবনের নীরসতা দূর করবার জন্য আদুরী মাঝে মাঝেই আকুল আগ্রহে অতীতের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। পূর্ব দাম্পত্য জীবনের এই স্মৃতি বিভোরতা আপাতভাবে স্বামীপ্রেমের নিদর্শন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে আদুরীর অসম্পূর্ণ দাম্পত্য বাসনার প্রকাশ। স্বামীর মুখ মনে পড়লে তার প্রাণ ডুকরে কেঁদে ওঠে। বিবাহিত জীবনের সুখ স্মৃতিকে সযত্নে আদুরী লালন করে অন্তরে অন্তরে। বৈধব্য সংস্কারের প্রতি আদুরীর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার সংলাপে ও কথাবার্তায়। তবু বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহে'র প্রচলন তাহার বঞ্চিত জীবনেও কিছু আশার সঞ্চার করেছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষ রাজা রাধাকান্তদেবের দলকেই সমর্থন জানালেও তার মন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। তার মনের মধ্যে বৈধব্য সংস্কার ও ভোগ বাসনার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় শিমূয়েল পিরবক্স এর *'বিধবা বিরহ নাটক'*। কলকাতা 'বাপটিষ্ট মিশন প্রেস' থেকে নাটকটি মুদ্রিত হয়। নাটকটির নাম পত্রে বলা হয়েছে,—যদি এই গ্রন্থ কারো কিনতে ইচ্ছে হয়, তবে কলকাতা মোকামের ইটালী কামার ডাঙ্গায় ভি.ও. আর চিহ্নিত বাটীতে লোক পাঠালে পাওয়া যাবে। নাট্যকার শিমূয়েল পিরবক্স ছিলেন ধর্মে মুসলমান। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে তিনি *'বিধবা বিরহ'* নাটক (১৮৬০) রচনা করেন। *'বিধবা বিরহ'* নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, —*''কয়েকদিন পূর্বে পরলোকগত এক ব্রাহ্মণের আদেশে এই পুস্তক রচনা। তাঁহার সেই আদেশানুসারে সেই বিষয়ে যে যে বিষয়ে আদিষ্ট) এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় এতদ্দেশীয় সামান্য ও ভদ্র স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন, রচনা করিয়া ইহার নাম বিধবাবিরহ নাটক রাখিলাম।''*[৪২]

'বিধবা বিরহ নাটক' ছয় অঙ্কে রচিত। অঙ্কগুলি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি, পঞ্চম অঙ্কে তিনটি ও ষষ্ঠ অঙ্কে তিনটি করে গর্ভাঙ্ক রয়েছে। *'বিধবা বিরহ নাটকে'* দেখানো হয়েছে ভদ্র ঘরের বিধবা কন্যা, পিতার ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে। গৃহত্যাগের পূর্বে সে অপরাধ পরায়ণায় যুক্ত হয়ে পড়ে। দুর্নীতিগ্রস্থ ঝি-এর সহযোগিতায় নঙ্গরা নামক এক নীচ দুশ্চরিত্র যুবকের প্রলোভনে ভুলে গহনাপত্র চুরি করে ঘর ছাড়ে। বাস্তব সমাজ সমস্যার এক নগ্ন নির্মম রূপ অঙ্কন করা হয়েছে এ নাটকে।

শ্রীশিমূয়েল পিরবক্স রচিত *'বিধবাবিরহ'* নাটকটি স্ত্রী চরিত্র নির্ভর নাটক। এ নাটকে, মনোমোহিনী, তাঁর মাতা, চাঁপা দাসী, পদি, মনোমোহিনীর দাসী, তাঁর আই সুখদা, মনোহারী, বামা, নঙ্গরা প্রভৃতি চরিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কাহিনী নির্মাণ করেছেন। নাটকের শুরুতে অর্থাৎ প্রথমাঙ্কে দেখা যায় মনোমোহিনী তার মায়ের কাছে মাসীর বাড়ি যাবার জন্য বায়না ধরে। মায়ের সামান্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের আবদারে রাজী হয়। মনোমোহিনী শাড়ী, গয়নায় সেজে ওঠে। মনোমোহিনীর মা চাঁপা দাসীকে বলে পালকির ব্যবস্থা করতে জানায়।

চাঁপা দাসী পালকির ব্যবস্থা করতে পঞ্চাদের বাড়ি যায়। পঞ্চা চাঁপার দিকে লক্ষ্য করে, চাঁপার অন্তঃস্বত্তা হবার প্রতি সন্দেহ প্রশ্ন করে। চাঁপা রাগান্বিত হয়ে জানায় যে, সে অবিবাহিত তাই তার সন্তান আসার সম্ভাবনা নেই। পালকি বাহক পঞ্চা, চাঁপাকে তার মৃত সন্তানের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চাঁপা যন্ত্রণাবোধ করে। চাঁপা জানায়,তার মনিব মনোমোহিনীর পিতাই তার মৃত সন্তানের পিতা। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে মনিবের সঙ্গে দাসদাসীদের এক অবৈধ সম্পর্ক।

দ্বিতীয়াঙ্কে, মনোমোহিনীকে তার মাসীর বাড়িতে দেখা যায়। মনোমোহিনীর মাসী পদ্মাবতীর মা অসুস্থ। পদ্মাবতী নিজের সন্তানাদি ও অসুস্থ মাতাকে নিয়ে অসহায়। পদ্মাবতীর কন্যা মনোহরী ও সুখদা। মনোহরী বিধবা। মনোমোহিনীও বিধবা। অবিবাহিত সুখদা নিতান্তই বালিকা। সুখদা 'রাঁড়' এর মানে জিজ্ঞাসা করে তার মাকে। স্বামী শব্দের অর্থটিও সে জানে না। সুখদা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মনোমোহিনী আরেকবার বিবাহ কেন করে না। উত্তরে সুখদার মা বলে,—"*দূর ২ পোড়ামুখী, একবার স্বামী মলে আরকি বিয়ে কত্তে আছে।*"[৪৩] কিন্তু সুখদা তার বাবার মুখে শুনেছিল যে যদি বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রথা চালু হয় তাহলে তিনি পুনর্বার বিধবা মনোহরীকে বিবাহ দেবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বিধবা মনোহরীকে তার বাবা পুনর্বিবাহ দিতে পারেননি।

দ্বিতীয় অঙ্কের, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মনোহরী ও মনোমোহিনী—দুই বোনের গল্প কথায় উঠে এসেছে বিধবা মানোমোহিনীর মানসিক কষ্ট—

> "*কামে কম্পান্বিত দেহ করি হায় হায়।*
> *পতির বিচ্ছেদে বুঝি মম প্রাণ যায়।।*
> *বিরহ অনল মম সদা জ্বলে মনে।*
> *বিধবা হইয়া আর বাঁচিবে কেমনে।।*"[৪৪]

যৌবনকালে উপনীত মনোমোহিনীর দেহ কামে জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু বিধবা মনোমোহিনীর

তনুমন শান্ত করার উপায় নেই,—

'' তনু মম জীর্ণ হল মদনের বাণে।

নাগর বিহনে ঘরে থাকিব কেমনে।।''[৪৫]

মনোমোহিনী দীর্ঘ বারো-চোদ্দ বছর যাবৎ বিধবা। শৈশব কালে পতির বিহনে বুঝতেই পারেনি পতিসঙ্গ সুখ কি জিনিস। শুধুমাত্র উপবাস, ব্রতপালন, আতপচাল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। বিধবা হওয়া অবধি কোনো পুরুষ মানুষের মুখও দেখেনি সে। মনোমোহিনীর পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি। ভালো খাওয়া, পরায় মনোমোহিনী কোনদিনও অভাববোধ করেনি। কিন্তু সে ভালো নেই। মনোমোহিনী কামপীড়ায় দগ্ধ। অন্যদিকে মনোহরী বিধবা হয়েও অনেক সংযত। মনোহরী সাত বছর বয়সে (বিধবা) রাঁড় হয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসে। অভাব তার নিত্য সঙ্গী। তবুও মনোহরীর মনে দুঃখ নেই। মনোহরী জানিয়েছে,—'' *...তথাপি দুঃখ করিনে কেননা যখন স্বামী নাই তখন আর কোন সুখের প্রয়োজন নাই...।*''[৪৬] কিন্তু মনোমোহিনী বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। কারণ বিধবাদের বিবাহ না হবার কারণে সমাজে বহু কুৎসা ছড়িয়ে পড়ে। মনোমোহিনী, মুক্তকেশীর পদস্খলন দেখেছে। মুক্তকেশী সাত আট বছরে বিয়ে হয়ে দশ এগারো বছরে রাঁড় হয়। মুক্তকেশী জৈব তাড়নাকে সংযত করতে না পেরে নিমে তাঁতীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। চার পাঁচটি ছেলেপুলের মা মুক্তকেশীর পদস্খলনের দুঃখ ও বিড়ম্বনা বিধবা মনোমোহিনীকে আঘাত করে।

মনোহরী বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। মনোহরী জানে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। কয়েক ঘরের বিধবা রমণীদের বিবাহও হয়েছে। কিন্তু বিধবা বিবাহ আইনসম্মত হলেও তৎকালীন সমাজে এর প্রভাব আশানুরূপ নয়। মনোহরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্বকে অনুভব করেছে। অন্যদিকে মনোমোহিনী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে স্বাগত জানালেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবহেলা করেছে। কারণ মনোমোহিনীর মনে হয়েছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের বিবাহের আশা দেখিয়ে পরক্ষণে তা ভঙ্গ করছেন। বিধবা মনোমোহিনীর প্রবল ইচ্ছা পুনর্বার বিবাহের। কিন্তু তা না হওয়ার ফলে তার মনে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছে। কিন্তু মনোহরী জানে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে প্রতিবাদ কতটা জোরালো। তাই সে বিপক্ষের মানুষদের সহ্য করতে পারে না। বিধবাদের সুখ হলে তাতে আর পাঁচটা মানুষের অসুবিধের কারণটা মনোহরী বুঝতে পারে না।

তৃতীয় অঙ্কে, দেখা যায় মনোমোহিনী মাসির বাড়ী থেকে ফিরে এলে, তার মাতা

কুশল সংবাদ নেয়। মনোমোহিনীদের বাড়ীর দাসী বামা পাড়াপড়শীর খবর নিয়ে আসে। বামার কথায়, বিধবা রমণীদের দুর্দশার চরম প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। প্রাণনাথ চাটুয্যের বড় ছেলে মাধব চাটুয্যের বড় মেয়েটি বাল্য বিধবা হয়। কিন্তু যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে জৈবিক চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে পদস্খলিত হয়, গর্ভবতী হয়ে পড়ে। মাধব চাটুয্যের বিধবা কন্যার ভ্রূণ হত্যার কারণে, সমাজের চোখে হয়ে ওঠে দুঃশ্চরিত্রা ও পাপী।

চতুর্থাঙ্কে, চণ্ডীমণ্ডপে জনতাদৃশ্য উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে নাট্যকার বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ নিয়ে সমাজপতিদের চিন্তাধারা ও সমাজ মানসিকতার ছবি তুলে ধরেছেন। চাটুয্যে বাড়ীর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলেছে বাদানুবাদ। রামগোপাল তর্কালঙ্কার, বেনো, বাড়ুয্যে, ভট্টাচার্য, বৈরাগী, কানাই, আচার্য্য পরস্পরের মধ্যে তর্ক চলেছে বিধবা নারীর গর্ভপাত ঘটানোর বিষয় নিয়ে। বিধবা রমণীদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তাদের দুঃখ ঘোচানোর প্রয়াস স্বরূপ পক্ষে-বিপক্ষে নানান চাপান উতোর চলেছে চণ্ডীমণ্ডপ সভায়। তাদের এই আলোচনায় উঠেছে এসেছে, বিধবার পদস্খলনের নানা সমস্যার কথা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বিধবারা পদস্খলিত হয়েছে। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নারীরা যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে নানা প্রলোভনের শিকার হয়ে সতীত্ব হারিয়েছে, কেউ বা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সমাজের কাছে লজ্জা নিবারণের স্বার্থে গোপনে ভ্রূণহত্যা চলেছে। সম্মানহানি হবার ভয়ে, লোকসমক্ষে নিজেদের ছোট হবার ভয়ে অনেক অল্পবয়সী বিধবা নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই দুরবস্থা দূর করার জন্য বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। চতুর্থ অঙ্কের, প্রথম গর্ভাঙ্কে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্যে তা স্পষ্ট,—"*বটে ২ আচার্য্য মহাশয় যাহা বলেছেন তাহা সত্য বটে; ভদ্রলোকের ঘরের কথা বাহির করাতে কেবল লজ্জার বৃদ্ধি হয় অতএব এই মন্দতা নিবারণ করণার্থে চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য বটে, এই মন্দতা কেবল বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ দেওয়াতে বিনাশ হইতে পারে, নতুবা এমন আর কোনো উপায় নাই যাতে কোরে এই রূপ মন্দ কর্ম্ম নিবারণ হয়।*"[৪৭] কিন্তু সমাজের গোঁড়া হিন্দুরা মনু সৃষ্ট নিয়মকে লঙ্ঘন করার ঘোর বিরোধী। তাঁদের ধারণা বিধবা বিবাহ হওয়া মানে খ্রীষ্টানদের সমতুল্য হওয়া। ভট্টাচার্য মহাশয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উনিশ শতকের লোকমানসকে তুলে ধরেছেন এইভাবে,—"*কি বলেন কি তর্কালঙ্কার মহাশয়, বিধবা বিবাহ দিয়া এই মন্দতা নিবারণ করতে হবে? বেশত একেত হিন্দু ধর্ম্ম দিনে২ লোপ পাইতেছে তাতে আবার বিধবা বিবাহ দিতে চাহিতেছে, এই কর্মটি করলেই হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেও আর কি? (উপহাস) এত উৎপাত করে কাজকি*

একিবারে খ্রীষ্টীয়ান হয়ে যাওনা কেন তাহা হলে কিছু ঝনঝটি থাকবে না"[৪৮]

চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, তর্করত্ন, ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য, বাড়ুজ্যে মহাশয়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা ও প্রামাণ্যতা বিষয়ক তর্কবিতর্কের অবতারণার করেছেন নাট্যকার। তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। ভট্টাচার্য্য ও তর্কালঙ্কারের কথোপকথনে নাট্যকার বিধবা বিবাহের সপক্ষে সওয়াল করেছেন। ভট্টাচার্য্যকে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এবং তর্কালঙ্কারকে বিধবা বিবাহের সপক্ষে,—যুক্তি পরম্পরায় সংলাপে '*পরাশর সংহিতা*'র প্রসঙ্গকে নাট্যকার উত্থাপন করেছেন। তর্কালঙ্কার যেন স্বয়ং বিদ্যাসাগরের প্রতিভূ। তর্কালঙ্কারের সংলাপে বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব'*-এর অনুরূপ প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। তর্কালঙ্কার পরাশর সংহিতার সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে,—

''নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।।
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণীং প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ ।।
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাত্তিস্তেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
জীবতি শ্রূয়মানে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ।।
অপ্রবৃত্তৌ ত্ব ভূতানং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহ ন্যগমনে স্ত্রীণামের দোষো ন বিদ্যতে।।

—ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুণর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক,যদি সন্তান না হইয়া থাকে চারি বৎসর নতুবা দুই বৎসর। শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোন সংবাদ না পাইলে পূর্ব্বোক্ত কাল নিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব এমত স্থলে স্ত্রীদিগের পূণর্ব্বার বিবাহ করা দোষবহ নহে। যদি এই বিধি বাগদত্তা কন্যার প্রতি হইত তবে সন্তান হইবার উল্লেখ থাকিত না। যখন সন্তানের উল্লেখ রহিয়াছে তখন এই বিধি যে বিবাহিতা

বিধবাদিগের প্রতি আছে ইহার কোন সন্দেহ নাই।''[৪৯]

তর্কালঙ্কার মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্লিখিত পরাশরসংহিতার শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে, ক্লীব হলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করলে, পতিত হলে সেই স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করতে পারে। কিন্তু তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয় মানতে নারাজ। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় আরোও বহু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন— কলিযুগের বিধবাদের জন্যই এ নিয়ম। তথাপি বাড়ুয্যে মহাশয় প্রশ্ন তোলেন যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহ হলে কেনো গোত্র উল্লেখ করা হবে। সেক্ষেত্রে, বিধবা রমণীরা তার পিতার গোত্রেই নিজেদের পরিচয় দেবে—এইরকম বিধান 'পরাশর সংহিতা'য় রয়েছে বলে জানান তর্কালঙ্কার। আর তাই বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা অবশ্য স্বীকার্য।

পঞ্চমাঙ্কে মনোমোহিনীর উদ্বেগ প্রকাশিত হয়। মনোমোহিনী, দাসীর কাছে জানিয়েছে, —তাঁর ব্যাকুল মন বাঁশীর সুরে দোল খায়। তাই সে বামাকে সেই বাঁশিওয়ালার খোঁজ নিতে পাঠায়। দাসী বামা, মনোমোহিনী এবং প্রেমিক পুরুষ নঙ্গরা গোপন আলাপচারিতায় ব্যস্ত থেকেছে। দাসী বামা, মনোমোহিনীকে, তাঁর প্রেমিক পুরুষ নঙ্গরার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অভিসারের পথ প্রশস্থ করে দেয় ও নঙ্গরাকে মনোমোহিনীর কক্ষে প্রবেশ করার পথ বলে দেয়। উতলা মনোমোহিনী পুরুষ সঙ্গমে মিলিত হবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

ষষ্ঠাঙ্কে মনোমোহিনী ও নঙ্গরার মিলন ঘটে। তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়। মনোমোহিনীর মান হলে নঙ্গরা পায়ে ধরে তার মান ভাঙায়,—

> *''শুন ২ সুবদনি ধরি তব পায়।*
> *কর ক্ষমা অপরাধ মম প্রাণ যায়।।*
>
> ....
>
> *বদন কোমল তুমি মিলাও বদনে*
> *শীতল করহ প্রাণ বারি দাও মনে।।''*[৫০]

ক্রমে মনোমোহিনীর মানভঞ্জন হয়। বিধবা মনোমোহিনী ও নঙ্গরা যৌবন প্রেমে ডুব দেয়। কিছুদিন পর মনোমোহিনীর গর্ভাবস্থার লক্ষণ দেখা যায়। মনোমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে। বিধবা মনোমোহিনী দেহসুখের উন্মাদনায় সমাজভয়কে উপেক্ষা করে নঙ্গরার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। বিধবা কন্যার গৃহত্যগে, সমাজ কলঙ্ক ভয়ে কুলীন বাড়ুয্যে মহাশয় স্ত্রীপুত্রসহ দেশত্যাগী হয়। দেশত্যাগী হওয়ার সময় তিনি অনুভব করেন বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা।

বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হলে ঘরে ঘরে এমনই বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। বাড়ুয্যে মহাশয় ঘর ছাড়ার সময় একটি একটি চিঠি রেখে। তাতে লেখা ছিল,—"*হে দেব বংশ হিন্দু লোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক এই জন্য তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই যদি কুলশীল জাতি মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।*"[৫১] বাড়ুয্যের এই শেষ সংলাপে যেন নাট্যকারের অভিষ্ট বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন বিধবার পুনর্বিবাহকে অস্বীকার করলে, সমাজে ব্যাভিচার দোষ ঘটতেই থাকবে। পরিত্রাণের একমাত্র পথ বিধবার পুনর্বিবাহ প্রদান।

শিমূয়েল পিরবক্‌স্ এর '*বিধবা বিরহ নাটকে*' স্ত্রীপক্ষীয় সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন অনেক বিধবার সুপ্ত যৌন বুভুক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল। বৈধব্য সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত অনেক বালবিধবা জ্বালা ভোগ করেছেন। বিধবা বিবাহ আন্দেলন সমস্যা সমাধান করেছে না ক্ষতি করেছে, সেই প্রশ্নই উত্থাপিত হয়েছে। 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলন হিন্দু সংস্করের প্রতিষ্ঠাকে শিথিল করে, বিধবা নারীদের ব্যভিচারের পথে প্রলুব্ধ করেছে,—এমনটা অনেক বিধবার বিশ্বাস। '*বিধবা বিরহ নাটকে*' নাট্যকার শিমূয়েল পিরবক্‌স লিখেছেন,—"*এখন সেই সাগরের (=বিদ্যাসাগরের) ঐরূপ তেজ ও কল্লোল কিছুই নাই—এখন কেউ তাঁর রবও শুন্তে পায় না, একিবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, বিধবাদিগের বিরহ আগুণে বারিপ্রদান না করে ঘৃত ঢেলে দিয়াছেন, কিনা যে কর্ম্মেতে হাত দিলেন তাহা শেষ কর্তে পাললেন না।*"[৫২]

অকাল বৈধব্য থেকে সমাজে যে ব্যভিচার সৃষ্টি হয়, এই বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে '*বিধবা বিরহ নাটক*'টি রচিত। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে এ নাটক রচিত। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়, আর ১৮৫৭ সালে বঙ্গদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহের ডামাডোল বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে খানিকটা স্তিমিত করে দেয়। *'বিধবা বিরহ'* নাটকে মনোহরীর উক্তিতে সমকালীন অস্থির সময়ের ছবি ধরা পড়েছে। মনোহরী জানিয়েছে,—"*সাগর মহাশয়ের ইহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, তিনি যৎপরোনাস্তি সাধ্য পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন, কেবল যে তিনি একা তা নয়, তাঁহার স্বপক্ষ বর্দ্ধমানের মহারাজা ও কলিকাতার অনেক ২ রাজা আর বাবুগণ ছিলেন। ইহারা কি না করতে পারেন তবে এটা যে সিদ্ধ হল না সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা আমাদেরই ভাগ্য দোষ বলতে হয়। কেননা, যখন এই বিধবাবিবাহের উদ্যোগ হতেছিল, প্রায় সেই সময় দুষ্ট নিমকহারাম সিপাইগণ যাহারা এতবছর*

অবধি সন্তান সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল, একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠল।...এমন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা সতত ভগবানচন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।"[৫৩] বস্তুত আকস্মিক সিপাহী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন স্থিমিত হয়ে গিয়েছিল। নাট্যকার সেই সমকালীন যুগসময়কে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়, শ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত *'বাল্যোদ্বাহ'* নাটক। *'বাল্যোদ্বাহ'* নাটকটি চারটি অঙ্কে বিন্যস্ত। বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির কথা বলতে গিয়ে নাট্যকার বিধবা সংকটের কথা উপস্থাপিত করেছেন। *'বাল্যোদ্বাহ নাটকে'*র প্রস্তাবনায় নাট্যকার নট-নটীর মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। *'বাল্যোদ্বাহ নাটক'* এর প্রথম অঙ্কের কাহিনীতে দেখা যায়, বলহীন নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী মায়াবতী তাঁর নবমবর্ষীয় পুত্র গোপালের বিয়ে দিতে উৎসুক। পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই নইলে লোকসমাজে লজ্জিত হতে হবে—এই চিন্তায় মায়াবতীর চোখের ঘুম চলে গেছে। পুত্রের জন্য মায়াবতীর উৎকণ্ঠার ফলে ধনাঢ্য বলহীন পুত্র গোপালের বিবাহের জন্য ঘটককে আহ্বান জানান। মায়াবতী পুত্র গোপালকে জন্ম দেন এগারো বছর বয়সে। সেই গোপাল নয় বছর বয়সে উপনীত হয়েছে। নবম বর্ষীয় গোপালের বিবাহ নিয়ে মায়াবতী সর্বদাই চিন্তিত। বলহীন নিজ পুত্র গোপালের বিবাহ দিতে চাইলে, সমাজ প্রথা, ধর্ম সামনে এসে দাঁড়ায়,—*''সন্তানটীর তো ত্বরায় বিবাহ না দেওয়া অযৌক্তিক বোধ হোচ্যে যে হেতুক মমাপেক্ষা বহুগুণে ধনহীন ব্যক্তিরাও স্ব২ সন্তান সন্ততিগণের সাতিশয় অল্প বয়সেই পরিণত সংস্কার সম্পন্ন করিতে যত্নবান হয়, অপর এই দেশের এই প্রথা, দেশাচারানুযাইক কার্য্য করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ইহাতো প্রসিদ্ধই আছে...।"*[৫৪]

ধনাঢ্য বলহীনের প্রতিবেশী ধনহীন বাল্যবিবাহে অসম্মত। ধনহীন গোপালকে আরোও বিদ্যার্জনের প্রেরণা দেয়। কিন্তু বলহীন অল্পবয়সে বিবাহ দিতে সম্মত। বালক গোপাল যক্ষা আক্রান্ত তবুও বলহীন মারণরোগকে তাচ্ছিল্য করে তার পুত্রকে বিবাহদানে আগ্রহী হয়। বলহীন ঘটকের কাছে দাবী করে যে,—*''তবে কিনা কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তির কন্যা হয়, আর দেখতে শুনতেও কিছু ভালো হয়।"*[৫৫] ঘটককে গোপালের অসুস্থতার কথা জানালে স্বার্থপর লোভী ঘটক শুধুমাত্র নিজ উপার্জনের স্বার্থে অসুস্থ গোপালের জন্য পাত্রী নির্বাচন করে।

বলহীনের বাল্যবিবাহ উদ্যোগকে তার প্রতিবেশী ধনহীন কোনভাবেই সমর্থন করেন

না। কারণ সে নিজে বাল্যবিবাহে অসুখী,—'' *...আমি অজ্ঞান অবস্থায় পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হোয়ে কি ক্লেশই না অনুভব করিতেছি?—সংসার ভরণ পোষণার্থে দিবানিশি কেবল অন্নচিন্তায় যাপন করিতেছি, লোকালয়ে বিবিধ কারণ বশত অবমানিত হইতেছি, ক্ষুধার্ত সন্তাগণের চিত্তভেদী রব সকল প্রতিক্ষণ কর্ণগোচর করিয়া অপনাকে শত২ ধিক্কার দিতেছি, ভার্য্যার ম্লান বদন দণ্ডে২ অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণকে প্রজ্জ্বলিত অনল শিখায় নিক্ষেপ করিতেছি এবং অপক্ক বীর্য্যে সন্তান উৎপাদন করিয়া পুত্রশোকে হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছি। আহা! হা! কি যন্ত্রণা হায়২!!''*[৫৬]

দ্বিতীয় অঙ্কে, গোপালের বিবাহের জন্য ঘটক পাত্রী নির্বাচন করে। বলহীনের বাড়ীতে বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্ন ও ঘটক উপস্থিত হয়। ঘটকের কথা অনুযায়ী, বুদ্ধিহীন-ধনে মানে কুলেশীলে সর্ব্বগুণে গুণাকর, নিস্কলঙ্ক, তেজবান কুলীন সন্তান। তার কন্যাটিও অতি সুলক্ষণা। বুদ্ধিহীন তার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাটির সঙ্গে নবমবর্ষীয়া গোপালের বিবাহ ঠিক করে। স্বার্থপর ঘটক মৃতপ্রায় বালকটির সঙ্গে ছোট্ট বালিকাটির সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করে,—'' *...হঁ! কেমন ''ঝোপ বুঝে কোপ'' মেরেছি; বলহীনের ছেলেটা তো মৃত বোল্যেই হয়, ওঁর আবার বিবাহ! তা আমাদের কি?''*[৫৭]

তৃতীয় অঙ্কে, বলহীনের পুত্র গোপালের বিবাহ উপলক্ষ্যে সুধীর ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথোপকথনে উঠে আসে বাল্যবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নানান অভিমত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাল্য বিবাহ সমর্থন করেন। সুধীর নামক বিচক্ষণ ব্যক্তিটি ভট্টাচার্য মহাশয়কে প্রশ্ন করলে ভট্টাচার্য মহাশয় রাগান্বিত হয়। সুধীর জানায়, নিতান্ত কিশোরী বয়সে বিবাহ কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভট্টাচার্য মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই টেনে বলে যে, রজস্বঃলা কন্যা কোনভাবেই অবিবাহিতা থাকবে না। যদি থাকে তবে সে বংশ নরকগামী হবে,—'' *দশ বৎসরের উর্দ্ধ হোলেই কন্যাকে রজস্বঃলা বলে আর কন্যা রজস্বঃলা হোলে কি মহাপাতক্ হয় জানিস?...তোর মতে রজস্বঃলা কন্যাকে অবিবাহিতা রেখে বংশকে নরকগামী কর্ব্যে?''*[৫৮]

বিদ্বান সুধীর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তি খণ্ডন করলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাকে তিরস্কার করে। আসলে, ব্রাহ্মণ্যকুল নিজেরা সমাজের উচ্চ আসনে বসিয়ে শুধুমাত্র লাভের আশায়, স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ভিন্ন নিয়মের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল যুগযুগ ধরে। যার ফলস্বরূপ—সমাজে অকাল বৈধব্যের শিকার হয়েছে বহু বঙ্গনারী। সুধীরের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অসামান্য ভাবে তৎকালীন সমাজের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন,—'' *সামান্য লাভের প্রত্যাশায়ে মানবগণ কি কুকর্ম্মই না কোর্ত্তে প্রবর্ত্ত হয়?...বলহীনকে কি বোল্‌বো,—স্বয়ং ব্যাধিযুক্ত হয়েও স্বল্প বয়সে*

বিবাহ করেছিলেন এবং তার ফল স্বরূপ তাহার পরিণেতা একটী গর্ভস্রাব প্রসব করেছে; আহা! হা বিধাতঃ আবার সেই দুর্ব্বল রোগী সন্তানের নিমিত্ত, একটী অবলা জ্ঞানহীনা কুমারীর চিরবৈধব্য কল্পনা কোরেছেন,—হায়! রে বঙ্গদেশবাসী কামিনীগণ! তোরা কি নিমিত্ত এই দয়াহীন দেশে জন্ম পরিগ্রহ কোরিস্? যে দেশে তোদের অজ্ঞানাবস্থায় তাহারই সঙ্গে মিলন হয়... একত্রে বাস কোর্ত্তে হবে, এক সুখেই সুখী হতে হবে, এবং এক দুঃখেই দুঃখীতে হতে হবেও যাহার বিচ্ছেদে জীবনের সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিয়ে চিরন্তণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণায় কালযাপন কোর্ত্তে হবে?—যে দেশে পিতা মাতাই আপনাদের পরম প্রেমাস্পদ কন্যাগণের প্রতি ঐ সকল নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে দেশে পাত্রের গুণাগুণ ও দৌবল্যাদি কিছুমাত্র বিবেচনা না কোরে চিররোগী ও অজ্ঞান শিশুদের হস্তে তোদের সমর্পণ করে!"[৫৯]

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় যে, বলহীনের পুত্র গোপালের যক্ষ্মা রোগ আরো বৃদ্ধি হয়েছে। বলহীন পুত্রের অসুখ নিবারণে কি করবেন ভেবে উঠতে পারেননি। ক্রমেই বলহীনের বিষয় সম্পত্তিও হ্রাস হয়ে গেছে। বলহীনের যক্ষারোগ আছে তাই বলহীনেরও আশঙ্কা হয়, পুত্র গোপালেরও হয়ত তার সঙ্গেই মৃত্যু হবে। বলহীন জানে যক্ষায় কেউ কোনকালেও আরোগ্য লাভ করেনি। বলহীন নিজে যক্ষারুগী তাই সন্তানও যে বলিষ্ঠ হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বয়ং বলহীন এবং তার পুত্রটিও মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ধনহীন, বলহীনের অবস্থা দেখে হতাশায় দীর্ণ হয়েছেন ও ভেবেছেন বাল্যবিবাহ দুঃখেরই নামান্তর। ধনহীন তা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে দুঃখে হতাশায় যন্ত্রণায় সমাজের এরূপ কুপ্রথায় বিদ্ধ হয়ে মনে মনে অপরাধপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আত্মহত্যা করেছে।

চতুর্থ অঙ্কের, তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় যে, গোপালের মৃত্যু হয়েছে। মায়াবতী, অম্বিকা, বলহীন, বুদ্ধিহীনের বিলাপে, অশ্রুজলে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা প্রকাশিত। কিন্তু গোপালের বিধবা স্ত্রী অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা অবলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ অবলা জানতেই পারে না যে, তার জীবনের কি পরিণতি হল। সে বুঝতেই পারে না যে তার ভবিষ্যত জীবন কতটা কঠিনতর হতে চলেছে। দুমাসের মধ্যে বিধবা হয়ে অবলা কঠিন বৈধব্যাচারে নিমজ্জিত হয়েছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে অবলার পিতা নিজ কন্যার দিকে তাকাতে পারেননি। বিধবা কন্যাটির মুখদর্শনে বুদ্ধিহীনের হৃদয় বেদনায় হাহুতাশ করেছে,—"*...আমার ঐ এক মাত্র কন্যা উহার মুখ নিরন্তর দর্শন করিয়া কেবল প্রজ্জ্বলিত মানানলেই দগ্ধ হবো; আবার ঐ নির্দ্দোষী বালিকাকে বলহীন যে দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছে তাহা কস্মিন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না।*"[৬০] বুদ্ধিহীন

শেষ পর্যন্ত এ যন্ত্রণার উপশম খোঁজে। সে বুঝতে পারে যে, বাল্যবিবাহ এক নরঘাতী প্রথা। এই প্রথায় কত অবলা কুলবালারা দারুণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কুলমান জলাঞ্জলি দিয়েছে। কত পুরুষ সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। বাল্যবিবাহ নামক কুপ্রথা সমাজের বুকে ঘাতক স্বরূপ। তাই সমাজের নারী জাতির দুঃখ উপশম করতে হলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিহীনের দুঃখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থার এক অসহায় পিতার দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন।

'বাল্যোদ্বাহ নাটক' এর মূল কাহিনী বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে রচিত হলেও, কাহিনীবৃত্তে বিধবা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কৌলিন্য প্রথা জনিত কারণে, বৃদ্ধের সঙ্গে নাবালিকা কন্যার বাল্যবিবাহ এবং পরিণতি হিসাবে অকাল বৈধব্য। সেই বৈধব্যের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয়েছে অবলা নারীরা। নাট্যকার এভাবেই বাল্যবিবাহের কুফলের সঙ্গে জড়িত বিধবা সংকটের কার্যকারণ সূত্রকে উপস্থাপন করেছেন।

উনিশ শতকে 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনকে ঘিরে সমাজের সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে পক্ষে-বিপক্ষে যেমন নানা মতামত গড়ে ওঠে, তেমনি গড়ে ওঠে পক্ষে-বিপক্ষের দলও। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (শর্ম্মা) *'দলভঞ্জন'* (১৮৬১) নাটকে বিধবাবিবাহ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বনকারী দুই যুযুধান দলের মানসিকতাকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। নাট্যকার বিধবাবিবাহ সমর্থনকারীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। 'দলভঞ্জন' নাটকে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিকতা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি তুলে ধরেছেন।

'দলভঞ্জন' তিন অঙ্কে রচিত নাটক। প্রথম অঙ্কের কাহিনী সংগঠিত হয়েছে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের দোচালায়। নাটকের কাহিনীতে আছে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গোছানোই তার লক্ষ্য। মধুসূদনের মধ্যে কোন শিষ্টাচার লক্ষ্য করা যায় না। বিধবা রমণীদের বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ,—''*আর দেকি দেকি কোন রকমে যে দিনকার রাঁড়ের বের দরুণ একটা দলাদলি পাকিয়ে তুল্তে [তুলতে] পারি।*''[৬১] মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নিজ স্বার্থের খাতিরে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে। অন্যদিকে ভবশঙ্কর বিধবা রমণীদের দুঃখে সমব্যথী হয়ে বিধবাদের পুনর্বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করে দল গঠন করে। ভবশঙ্কর জানিয়েছে,—''*এরূপ অল্প বয়স্থা বিধবা অবলার বিবাহ হইলেই তো দেশের মঙ্গল আর ইহা নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত কর্ম।*''[৬২] ভবশঙ্কর মনে করেন,

দেশহিতৈষী অশেষ গুণসম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ বিষয়ে যেভাবে যত্নশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন তাতে অনভিজ্ঞ সামান্য লোকের প্রয়োজন ক্রমান্বয়ে ফুরিয়েছে। স্বার্থপর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এ ধরণের উদার মানসিকতায় বিশ্বাসী নয়। তিনি নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতায় মধুসূদনের স্বার্থে আঘাত লাগে। তিনি ভাবেন ভবশঙ্কর অর্থলোভে বিধবা বিবাহের দলে মিলিত হয়েছে। বস্তুত *'দলভঞ্জন'* নাটকে রীতিমত বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি দলের তর্ক-বিতর্ক তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

মধুসূদনের মতো নীলকণ্ঠ, ভূতনাথ, কান্তিচন্দ্র, অম্বিক প্রমুখ বিধবা বিবাহে অসম্মতি প্রদান করে নিজেদের গোঁড়া হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য দল গঠন করেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনীস্থল বকুলতলার পুষ্করিণী। বিমলা, মালতী, রাধামণি, তারামণি ও ছোটবধূ প্রভৃতি মহিলারা বকুলতলায় পুষ্করিণীর সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা-বিবাহ নিয়ে তর্কে-বিতর্কে ব্যস্ত থেকেছে। রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে সব ব্রাহ্মণেরা যোগদান করবে না বলে ঠিক করে। রাখালচন্দ্র বিধবাবিবাহে সম্মতিদানের প্রতিদান স্বরূপ ব্রাহ্মণজাতির দ্বারা বয়কট হয়েছে। রাখালচন্দ্র বুঝতে পারে, দেশটা শুধুমাত্র দলাদলিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাখালবাবুর মতসমাজ হিতৈষী গোপালবাবুও অনিষ্টকারী দলাদলির কুফল দেখতে পাচ্ছেন। অন্যদিকে রামবল্লভ চক্রবর্তী, পার্ব্বতীচরণ রায়, মহেশচন্দ্র মজুমদার, রামতরণ লাহিড়ী প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুয়ানির ধর্মকে ভিত্তি করে নানা ভাবে বিরোধিতা করেছেন। এঁদের দল গঠনের উদ্দেশ্য শুধু অর্থলোভ। সামাজিক কিছু অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সরব হলেই এঁরা বিরুদ্ধ দল তৈরি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছেন। সমাজ হিতৈষী গোপালবাবুর আক্ষেপ,—*'' আমরা কেবল বিধবা বিবাহ দিতে গিছ্লুম বল্যেই আমাদের জাত্ গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে কত লোক কত শত মন্দ কর্ম্ম কোচ্চে তাতে তাদের জাত যায় না।''*[৬৩] বোঝা যায়, অস্পৃশ্যতার মতই সমাজে বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীদের একঘরে করবার যে প্রবাহ চলেছিল তাকে নাট্যকার অসামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন। *'দলভঞ্জন'* নাটকে বিধবা বিবাহ সমর্থন ও অসমর্থনের চাপান-উতরের পাশাপাশি মদ গাঁজা আফিম ইত্যাদি নেশার কুফল দেখানো হয়েছে।

হরিশচন্দ্র মিত্র ছিলেন, উনিশ শতকের বিশিষ্ট প্রহসনকার। প্রহসন রচনা করতে গিয়ে তিনি 'ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে হরিশচন্দ্র মিত্র *'শুভস্য শীঘ্রং'* (১৮৬১) ও *'ম্যাও ধরবে কে'* (১৮৬২) নামে দুটি নাটক রচনা করেন। এই দুটি নাটকে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর সংকট চিত্র। হরিশচন্দ্র মিত্রের *'ম্যাও ধরবে*

কে?' (১৮৬২) নাটকটি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত। সমাজ সংস্কারে বাগাড়ম্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সমালোচনা করে ও বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে *'ম্যাও ধরবে কে?'* প্রহসন নাটকটি রচিত। *'ম্যাও ধরবে কে?'* প্রহসনের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন,—''*এদেশীয় বিধবাবিবাহ প্রচলনোদ্যোগি-স্বাক্ষরকারীদিগকে উত্তেজনা করণাশয়ে বিগত বর্ষের অগ্রহায়ন মাসে "শুভস্য শীঘ্রং'' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। আমি যে সময়ে ঐ পুস্তক প্রচারিত করি, তখন ভরসা করিয়াছিলাম স্বাক্ষরকারীগণ অনতিবিলম্বে আপনাদিগের স্থির প্রতিজ্ঞা প্রদর্শিইয়া এ প্রদেশে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত করিয়া তুলিবেন। এক্ষণে সে আশা অন্তঃকরণ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ যেরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, তাঁহারা কৃতার্থতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ঘটনাপোলক্ষে এ প্রদেশে সাধারণ্যে যে রূপ চর্চা হইতেছে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইল।'*'[৬৪]

'ম্যাও ধরবে কে?' দুই অঙ্কে রচিত নাটক। প্রতি অঙ্কে দুটি করে গর্ভাঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, কমলিনী, কুমুদিনী, সরলা, কামিনী প্রমুখের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে উপস্থাপনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ সম্পর্কীত মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের, প্রথম গর্ভাঙ্কে বিধবা কুমুদিনীকে বিবাহে শশাঙ্কমোহনের অসম্মতি প্রদান। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিধবা বিবাহ না হওয়ার সমাজিক কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। এ নাটকে দুই পক্ষকে হাজির করেছেন নাট্যকার। একপক্ষ বিধবা বিবাহের পক্ষে, অন্যপক্ষ বিধবা বিবাহের বিপক্ষে। বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহকে কেন্দ্র করে এ নাটকের কাহিনী ঘনীভূত হয়েছে। বিধবা কুমুদিনীকে প্রভাতবাবু, ঈশ্বরবাবু প্রমুখ নব্য যুব সম্প্রদায় পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, বিদ্যাভূষণ, কবিকঙ্কণ প্রমুখ প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলের দল বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা সঞ্চার করেছেন।

প্রভাতবাবু গোপনে বিধবা কুমুদিনীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে মতামত নিয়ে জানতে পেরেছে সে, শশাঙ্কমোহনকে ভালোবাসে। শশাঙ্কমোহনও কুমুদিনীকে ভালোবাসে, নাটকের অন্তিমে দেখা গেছে, সমাজ অনুশাসনের ভয়ে, শশাঙ্কমোহন বিধবা নারীর পুনর্বিবাহে অসম্মত হয়েছে এবং পালিয়ে এসেছে এই পুনর্বিবাহের সংস্পর্শ হতে। শশাঙ্কমোহনের পত্রসূত্রে জানা যায়, অভিভাবক, স্বদেশ ও স্বজন ও সমাজের ভয়ে সে বিধাবার বিবাহ হতে বিরত থেকেছে। সে জানিয়েছে অন্য কেউ বিধবা বিবাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে, সে বিধবা বিবাহে এগিয়ে আসতে পারে।

'ম্যাও ধরবে কে?' নাটকের নায়ক শশাঙ্কমোহন ভীরু ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী। অন্যদিকে নায়িকা কুমুদিনী যুবতী বিদূষী রূপেই চিত্রিত। কুমুদিনী তাঁর বোন মোহিনীর বিবাহে অনুপস্থিত থাকতে চেয়েছে তাঁর কল্যাণ বোধে। কুমুদিনী ভেবেছে শুভকাজে বিধবারা অশুচি, অপবিত্র। এ কারণে তাঁর দুঃখ অন্তঃহীন।

এ নাটকের অন্তিমে প্রভাত মজুমদার, হর, রমেশ, তর্করত্ন প্রমুখের সংলাপে বিধবা বিবাহের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নাট্যকার দীর্ঘ এক নাট্যসংলাপ রচনা করেছেন,—"*[প্রভাত দন্ডায়মান হইয়া] হে সভাস্থ সজ্জনগণ! আপনারা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলুল [ন] দেখি, এ প্রদেশের বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা উচিত কিনা? যখন কোন বিধবা সোচনীয় বেশে আপনাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তিণী হয়, তখন আপনাদের বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আত্মিক অভিলাষ জন্মে কিনা?*"[৬৫]

প্রভাতের এই বক্তব্যেকে সমর্থন করেছেন মজুমদার। মজুমদার প্রভাতকে সমর্থন করে বলেছেন,—"*যথার্থ। যখন আপনারা কোন বালবিধবাকে একাদশী প্রভৃতি ব্রতোপলক্ষে পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া বিষন্ন দবনে জলপানের নিমিত্ত জনক জননীর নিকট কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখেন, তখন এ প্রদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে আপনাদিগের আন্ত্রিক বাসনা জন্মে কি না?*"[৬৬]

রমেশ জানিয়েছে,—"*(স্বগত) সত্য, সন্দেহ কি।—যখন কোন সম্ভ্রান্ত ফুলদ্ভবা [কুলদ্ভবা] বিধবা রমণীর ব্যভিচার বৃত্তান্ত আপনাদিগের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয়, তখন এ প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আপনাদিগের আন্ত্রিক বাসনা জন্মে কিনা?*"[৬৭] হর রমেশের এই মতামতকে সমর্থন জানিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। হর বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বলেছেন, —"*যথার্থ।—যখন কোন বিধবার ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি উৎকট পাপের মোচনীয় সংবাদ আপনাদিগের শ্রুতিরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তখন এ প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আপনাদের একান্ত ইচ্ছা জন্মে কিনা—*"[৬৮] *তর্করত্ন মহাশয় এই বক্তব্যের সমর্থন করে বলেছেন,—"(স্বগত) নিঃসংশয়।—যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে এ দেশের অসংখ্য পাপের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে—অসংখ্য বিধবার অশ্রু জল নিবারিত হইয়া যাইবে—অসংখ্য জীবের অকাল মৃত্যু নিরাকৃত হইয়া যাইবে, অসংখ্য কুলকামিণীর ব্যাভিচার আশঙ্কা উন্মুলিত হইয়া যাইবে, এক দেশাচারের অকিঞ্চিৎকর অনুরোধে ঈদৃশী মহোপকারিণী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পরান্মুখ থাকা কি আপনাদের উচিত? না বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যের উচিত?*"[৬৯]

বস্তুত বিধবা বিবাহে অগ্রণী ভূমিকা নেবে কে? এই দ্বিধাগ্রস্থতা এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কে? এই প্রশ্ন নাট্যকার তুলেছেন *'ম্যাও ধরবে কে?'* নাটকে। প্রচলিত প্রবাদকে সামনে রেখে নাট্যকার আলোচ্য নাটকের নামকরণ করেছেন, *'ম্যাও ধরবে কে?'*। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত পাশ হয়। আর, *'ম্যাও ধরবে কে?'* নাটক প্রকাশিত হয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৬১ সালে। অর্থাৎ তখনও বিধবা বিবাহ নিয়ে ছিল সামাজিক ভীতি ও কুণ্ঠাবোধ। সে কথাই এ নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ নাটকের গদ্যসংলাপে প্রাচীন যাত্রারীতি অনুসৃত হয়েছে।

১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয় *'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক'।* কুশদেব পাল পেশায় আইনজীবী ছিলেন। নাট্যকাহিনীর পাশাপাশি নাট্যকার আইনের নানা প্রসঙ্গ এ নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। *'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক' সম্পর্কে* নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন,—*''বটতলার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দে'র পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক একখানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল। লালবিহারী একদিন দোকান হইতে আমাকে একখানি নাটক পাঠাইয়া দিল,—তাহার নাম 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক'। ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে। Preparatory class -এর মার্শমান পাঠ করিয়া কখন যে ওখানা পড়িতে পাইব, তাহার জন্য অস্থির হইয়া রহিলাম। পড়িয়া দেখিলাম, —কথোপকথন ছলে সমস্ত পিনাল্ কোড্খানা নাটকে পরিণত করিবার চেষ্টা! বুঝিতে পারিলাম ডাক্তার যদুগোপালের 'ধাত্রীশিক্ষা'র ধরণটুকুর অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে লেখকের এই বিষম বিড়ম্বনা। Dialogue-এ কিছু লেখা হইলেই তা নাটক হইল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উকিল-গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন।''*[৭০]

'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী' নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, রমণীমোহন সদানন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত। গদাধর সেনের বিধবা কন্যা কাদম্বিনী, রমণীমোহনকে ঠাকুরদাদা বলে সম্বোধন করে। কাদম্বিনীর যে বছর বিবাহ হয়, সেই বছর বিধবা হয়। কাদম্বিনী তার বৈধব্য দশা ও যৌবনের ধর্মকে আড়াল করতে পারেনি। কাদম্বিনী রমণীমোহনকে কটাক্ষের দ্বারা আকর্ষণ করে। রমণীমোহনও সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিধবা কাদম্বিনী যৌবনধর্মে চঞ্চল হয়ে ওঠে,—

''রজনী হইল যবে, ঘন্টা নয় দশ।
অদর্শনে উভয়ের, শূন্য দিক্ দশ।।
রমণীমোহন ভাবে, একি সর্ব্বনাশ।

কামিনীর হেরি বুঝি, দেহ হয় নাশ।।"[৭১]

অন্যদিকে রমণীমোহনের চিত্ত কাদম্বিনীকে পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। কাদম্বিনী ও রমণীমোহন উভয়েই পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে দুজনেই পরস্পরের সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করে। নানা অছিলায় কাদম্বিনী রমণীমোহনকে নিজগৃহে নিয়ে আসে। পরস্পরের ব্যকুলতা বিরহে পরিণত হয়।

রমণীমোহন তারকেশ্বরে পুজো দেয়। বাড়ী ফিরে কাদম্বিনীর অদর্শনে দিনাতিপাত করে, বিরহ যাপন করে। রমণীমোহন অস্থির হয়ে পুণরায় সদানন্দের বাড়ীতে আসে। কাদম্বিনীও রমণীমোহনের দর্শন পেয়ে আহ্লাদিত হয়। রমণীমোহন, কাদম্বিনীর মনোভাব জিজ্ঞাসা করলে কাদম্বিনী ছলনা করে। কাদম্বিনী ইচ্ছাকৃত ভাবে রমণীমোহনের ব্যকুলতা বাড়িয়ে দেয়। রমণীমোহন কাদম্বিনীকে কাছে পেয়ে, নিবিড় করে পেতে চায়। কিন্তু কাদম্বিনী নিজের মনের ইচ্ছা গোপন করে, রমণীমোহনের মনকে যাচাই করে নেয়। কাদম্বিনীর কথায় আদিম যৌন ইচ্ছা জাগ্রত হয়। কিন্তু কাদম্বিনী সংঙ্কুচিত ও শঙ্কাগ্রস্থ হয়ে জানায়,—"*...তা ভাই হবে না সে আশা ছাড় দেখে শুনে যে ভয় হয়, বিশেষ তাও যা হোক্ একটা দায় ভারি শক্ত, সেবার বড় বাড়ীর মেজো কর্ত্তার মেয়ে ৫।৬ মাস চুপি চাপে রেখে শেষ ফেলবার জন্যে কত লাঞ্ছনা সে কথা বলবার নয়, তা মনে কল্লে গা সিউরে ওঠে, গায় জ্বর এসে।*"[৭২] বস্তুত উনিশ শতকের বহু ঘরেই এই ধরণের ভ্রুণহত্যা ঘটে থাকত। বিধবা নারীরা আদিম ইচ্ছার বশীভূত হয়ে পুরুষ সঙ্গমে লিপ্ত হত। পরবর্তীতে, সন্তান ধারণ করলে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রণহত্যার মত পৈশাচিক কাজে লিপ্ত হত।

কুশদেব পাল তাঁর *'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটকে'* এ ধরনের নারকীয়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাদম্বিনী ও রমণীমোহনের মিলন ইচ্ছার ফলস্বরূপ সন্তান ধারণের আশঙ্কায় কাদম্বিনী ভীত হলে ভবিষ্যতে রমণীমোহন তার প্রতিকার স্বরূপ জানিয়েছে,—"*তুমি যেই জন্য ভাব্‌চ? তার জন্যে ভয় কি আমি পাঁচ সাত রকম ঔষধ জানি, তা আর ভাব্‌তে হবে না, একটা শুনবে? অফুলো কদমের বিচি সওয়া ছগণ্ডা, আর নির্ম্মূল করবীর শিকড়, আর খাসী ছাগলের দুধ দিয়ে বেটে চারি দিনের দিন খেলে, এ জন্মে আর সে ভোগ ভুগতে হবে না।*"[৭৩] অর্থাৎ বিধবা কাদম্বিনী বাঁজা রমণীতে পরিণত হবে।

কিছুদিন পর কামার্ত রমণীমোহন রাত এগারোটার সময় নানান ফন্দি এঁটে সকলের অলক্ষ্যে কাদম্বিনীর ঘরে প্রবেশ করে ও তার মনোভাব জানতে চায়। কাদম্বিনী রিপুর কাছে হার

মানে ও ধর্মরক্ষায় অসমর্থ হয়। রমণীমোহন ও কাদম্বিনীর মিলন হয়। পাঁচ দশ দিন অন্তর অন্তর তাদের মিলন ঘটে। এইভাবে রমণীমোহন ও কাদম্বিনী দীর্ঘ চার পাঁচ বৎসর একসঙ্গে রাত্রিবাস করে। ইতিমধ্যে কাদম্বিনী মামার বাড়ী গেলে সেখানেও রমণীমোহনের সাক্ষাতে কাদম্বিনীর সম্ভোগসুখ ঘটে। কিন্তু রমণীমোহনের ধীরে ধীরে মনের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। রমণীমোহনের লোকনিন্দার ভয়, আলস্য সবকিছুই ধীরে ধীরে কাদম্বিনীর প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। রমণীমোহন কাদম্বিনীর সঙ্গসুখ চায় ঠিকই কিন্তু তাকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে চায় না। কাদম্বিনী রমণীমোহনের প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত হলেও চতুর রমণীমোহন শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য লালায়িত হয়।

একদিন রমণীমোহনের গৃহে পূজা উপলক্ষ্যে কাদম্বিনী উপস্থিত হলে, নির্জনে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সেইস্থানে রমণীমোহনকে কাদম্বিনী জানায়,—"*...এখন একটু ঠাঁই দেওগে তোমার নিকট থাকি।*"[৭৪] কিন্তু রমণীমোহন সংকুচিত। স্বগতঃ ভাষণে রমণীমোহনের কাদম্বিনীকে প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়েছে। চতুর রমণীমোহন কাদম্বিনীকে সান্ত্বনা দেয় ও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেয়। অতঃপর রমণীমোহনের মিথ্যা আশ্বাসের ফলস্বরূপ কাদম্বিনীর গৃহত্যাগ করে,—

"*এখানেতে কাদম্বিনী, হইয়া অস্থির।*
বোচ্‌কা বিড়ে বেঁধে ধনী, হইল বাহির।"[৭৫]

কাদম্বিনী মাঝরাতে রমণীমোহনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বের হয়। নাপেতানীর সাহায্য প্রার্থনা করে কাদম্বিনী। কিন্তু নাপেতানী তাকে সাহায্য না করে বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ করে। কাদম্বিনী নাপেতানীর অনুরোধ উপেক্ষা করে বৈষ্ণমীর সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু বৈষ্ণবীও কাদম্বিনীকে ঘরে ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কাদম্বিনী নাছোড়বান্দা। কিছুতেই কাদম্বিনী ঘরে ফিরে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। রমণীমোহনই কাদম্বিনীর সর্বস্ব। তাই রমণীমোহনের আশ্রয়েই সে বাঁচতে চায়। বৈষ্ণমী কাদম্বিনীকে বলে যে জাত কুল মান খোয়ালেও যদি বাপের গৃহে ফিরে যাওয়া যায়, তবে অন্তত তার ভবিষ্যত কষ্ট কিছুটা হলেও কম হবে। অন্ন সংস্থান হবে। মাথার উপর ছাদ থাকবে ও জীবনের সুরক্ষা থাকবে। বাড়ীর বাইরে তার একান্ত অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। বৈষ্ণমীর কথায় তৎকালীন সমাজের কঠোর বাস্তব দিকটি ফুটে উঠেছে।

কাদম্বিনী বৈষ্ণমীর কথায় কর্ণপাত করে না এবং রমণীমোহনের কাছে যায়। ভীতু ও স্বার্থপর রমণীমোহন লোকনিন্দার ভয়ে কাদম্বিনীকে নিজের কাছে এনে রাখে না বরং বৈষ্ণমীর

ঘরে থাকতে বলে,—'' *...এখন আমি বলি কি সেই বৈষ্ণমীর বাটীতে দিনকতক কাটাও পরে বিবেচেনা করা যাবে নৈলে এখন এখানে আন্‌লে আমার বড় বদ্‌নাম হতে পারে।*''[৭৬] স্বার্থপর রমণীমোহনের প্রতি সরল কাদম্বিনী নিজপ্রাণ মন সঁপেছে। কাদম্বিনী জানায়,—'' *আপ্নার যা ইচ্ছে হয়, আমাকে বৈষ্ণমীর বাড়ি রাখুন আর জলে রাখুন, বা জঙ্গলে রাখুন, যেখানে রাখেন সেইখানেই থাক্‌ব, এখন আমি কষ্ট পাই সেও ভাল তাতে হানি নাই, ফলে আপ্নার কোন রকমে কষ্ট না হয় তাই করুণ।*''[৭৭]

বস্তুত উনিশ শতকের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর কাছে তার স্বামীই সর্বস্ব। মৃত স্বামীর ভার্য্যা হয়ে গোটা জীবন কাটানো একজন নারীর পক্ষে বেদনাদায়ক। ফলত, চোখে পড়ে বিধবাদের চারিত্রিক স্খলন। বিধবা রমণীর ঠাঁই হয় অন্যত্র। যারা খোঁজে তার প্রিয় মানুষটির আশ্রয়, খুঁজে নিতে চায় তার সুখ। তাতে যদি বিধবা নারীর সর্বস্ব লুঠ হয় তাতেও সে সুখী। কাদম্বিনীও ঠিক তাই। রমণীমোহনের প্রতি কাদম্বিনী প্রবল নির্ভরতায় সমর্পিত। তাই কাদম্বিনীর নিজ দুঃখকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে রমণীমোহনের সম্মান।

মাস দুয়েক পর কাদম্বিনীকে নিয়ে রমণীমোহন নগরের অন্যত্র একটি বাড়ীতে বসবাস শুরু করে। কাদম্বিনীর সঙ্গে প্রথম কয়েকদিন বেশ ভালোই কাটে রমণীমোহনের। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস পর থেকেই রমণীকোহনকে লোকমুখে নিজ অপমান শুনতে হয়। বিরক্ত রমণীমোহন কাদম্বিনীর সঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই কাদম্বিনীকে অন্যত্র রাখবার ফন্দি আঁটে। সরল কাদম্বিনীর মন রমণীমোহনকে অন্ধবিশ্বাস করে বাঁচতে চায়,—'' *সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য, পূর্ব্বে বলাই আছে, আমি কষ্ট পাই হানি নাই, আপ্নি যাতে কষ্ট না পান তাই কর্‌বেন।*''[৭৮]

রমণীমোহন কাদম্বিনীর সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ করবে বলে জানায়। ইতিমধ্যে কাদম্বিনীর সঙ্গে প্রতিবাসিনী জগদম্বার সাক্ষাৎ হয়। জগদম্বাকে কাদম্বিনী জানায় যে সে রসিকগঞ্জে ভগীময়রাণীর বাড়ীতে কিছুদিন থাকবে। ভাগ্যবিড়ম্বিত জগদম্বা সরল কাদম্বিনীকে সতর্ক করে বলে যে, সে যেন রসিকগঞ্জে না যায়, তাহলে কাদম্বিনী রক্ষা পাবে। জগদম্বার কথা বুঝতে পেরে কাদম্বিনী ভয় পায় ও সাবধান হয়। কাদম্বিনী রমণীমোহনের ফন্দি বুঝতে পেরে গহনা ও নানান দামী দামী জিনিস দাবী করে তার কাছে। ধূর্ত রমণীমোহন কাদম্বিনীর চালাকি বুঝতে পারে। কাদম্বিনীর প্রতি ক্ষিপ্ত রমণীমোহন কাদম্বিনীকে উপেক্ষা করে। রমীমোহনের অভিসন্ধি সিদ্ধ না হওয়ায়, সে কাদম্বিনীকে শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র দেওয়ার কথা স্বীকার করে। মাসিক ৩ টাকা

দিয়ে রমণীমোহন কাদম্বিনীর প্রতি দায়িত্ব পালন করবে বলে জানায়।

ভালোবাসার মোহে, জীবন উপভোগের তাগিদে কাদম্বিনী কুলমান খুইয়ে রমণীমোহনের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেই রমণীমোহনই যখন কাদম্বিনীর প্রতি বিমুখ হয়েছে তখন কাদম্বিনীর দুঃখ অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকার কুশদেব পাল ভণিতার ঢঙে লিখেছেন,

—"*কুশদেব বলে ধনী, কাঁদিলে কি হবে।*
কুল খেয়ে আসিয়াছ, কূল নাহি পাবে।।"[৭৯]

প্রতিবেশী জগদম্বার পরামর্শে ভাগ্যবিড়ম্বিত কাদম্বিনী উকিলের দারস্থ হয়। উকিলের পরামর্শমত কাদম্বিনী দেওয়ানীতে নালিশ করে। দেওয়ানীতে নালিশের আরজীর মুসাবিদা অনুযায়ী কাদম্বিনী রমণীমোহনের কাছে প্রতিমাসে ১০ টাকা করে মাসিক খরচের দাবী করে। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয় না। কাদম্বিনী বুঝতে পারে যে, রমণীমোহনকে আর কোনভাবেই ফেরানো সম্ভব নয়। কাদম্বিনীর শরীর জীর্ণ হয়ে আসে। এদিকে জগদম্বা কাদম্বিনীকে বোঝায় যে,—"*...তুই যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকিস্ আর যদি মনে করিস তবে তার মত কত বাবু এই দ্বারে গড়াগড়ি যাবে।*"[৮০] কিন্তু কাদম্বিনী রমণীমোহনের প্রতি অধিক আসক্ত। যৌবন রিপুর তাড়নায় বিধবা কাদম্বিনী পরকীয়ায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। পরকীয়ায় সর্বস্ব হারিয়েছে কাদম্বিনী। নিঃসঙ্গ বিধবা কাদম্বিনীর পরিণামের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের বহু অসহায় বিধবা রমণীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'পুনর্ব্বিবাহ নাটক'*। এনাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে, একটি নারীর ঋতুমতী হওয়ার পর স্বামী দ্বারা পুনঃগ্রহণের উৎসবের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে দেখা যেত, বাল্য বিবাহের পর কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করতেন। কন্যা যৌবনবতী হলে তথা ঋতুমতী হলে তাঁকে শ্বশুর গৃহে পাঠানো হত। হিন্দু সমাজে বিবাহের পর নারী প্রথম ঋতুমতী হলে তাঁকে ঘিরে স্বামী দ্বারা পুনঃ গ্রহণের অনুষ্ঠান হত। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে পাড়া-প্রতিবেশী বিবাহিত-অবিবাহিত মহিলারা জড় হতেন, হাসি-ঠাট্টা আনন্দে মসগুল হতেন, রসসম্ভোগ করতেন। গায়ে হলুদ, সিঁদুর দান সবকিছুতে অংশ গ্রহণ করতেন হিন্দু বিবাহিত রমণীরা। বিধবা নারীরা এধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁদেরকে অমঙ্গলের দ্যোতক হিসাবে দেখা হত। দূর থেকে বিধবা রমণীরা এধরণের অনুষ্ঠান দেখতেন এবং মনে মনে আক্ষেপ করতেন। তেমনই এক দৃশ্যকে নাট্যকার এখানে উপস্থিত করেছেন। বিধবা রমণীরা তাঁদের বঞ্চিত জীবনের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করতেন। অপূর্ণ

যৌনতার আখ্যানকে নাট্যকার দৃশ্যকাব্যে তুলে ধরেন।

'রাঁড়ের বে'র ব্যবস্থা দিয়েছেন বলে, বিদ্যাসাগর বিধবা রমণীদের কাছে বাহবা পেয়েছেন। অক্ষর পরিচয়হীন অশিক্ষিত বিধবা নারী বিলাসবতী। সে বিদ্যাসাগর নামটি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। স্বামীর অবর্তমানে সে একাদশী পালনে অরুচি প্রকাশ করে। জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হবার পূর্বেই সে তার স্বামীকে হারিয়েছে। বৃদ্ধ স্বামী তাঁর কাছে শৈশবের এক ঝাপসা স্মৃতি। মনের কোথাও তাঁর স্বামীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তার মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামী মানেই যদি একাদশীর নির্জলা উপবাস, বিবর্ণ সাদা কাপড়, তেলহীন শুষ্ক চুল, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবেশের বাধানিষেধ তাহলে সে স্বামীকে কেন স্মরণ করার চেষ্টা। বাল বিধবা বিলাস জানিয়েছে, —''*এই যে আমার ভাতার বের হল্‌দে কাপড় না ঘুচতে ঘুচতেই পটল তুললো, তা কি করবো বল? এ বলে কি দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে শরীর খোয়াব।*''[৮১]

বিধবা বিবাহের সমর্থনে মধুসূদন দত্তের সুহৃদ গৌরমোহন বসাক ১৮৬২ সালে লেখেন *'অশুভ পরিহারক'* নামক প্রহসন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'অশুভ পরিহারক' প্রহসন। অধুনা দুস্প্রাপ্য এই প্রহসনের উল্লেখ সমালোচক অশোককুমার মিশ্রের *'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস'* গ্রন্থে মেলে। ৫১ পৃষ্ঠার বড় মাপের এই প্রহসনে গৌরমোহন, নীতিবাগীশের ভূমিকা নিয়েছেন। বাল্য বিধবাদের নিয়ে সমাজে যে ব্যভিচার এবং অবিচার বাংলার নারী সমাজের সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ ছিল, এই প্রহসনটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে তাই বিন্যস্ত হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—মহেন্দ্র, মহিম আর উপেন্দ্র তিন শিক্ষিত যুবক রাজপথে চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে—ধর্মধ্বজী সমাজপতিরা বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করে চলেছে; কারণ বিধবা-বিবাহ চালু হয়ে গেলে 'অনেকের রাসলীলা সম্বরণ' হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত উঠেছে এক সমাজপতি শ্যামচাঁদের কথা। তার দশ বছরে বিধবা-হওয়া-কন্যা যুবতী হয়ে গর্ভবতী হয়েছে বৈরাগী বাবাজীর দ্বারা। পাড়ার লোকেরা সব জানতে পেরে বৈরাগীর উপর চড়াও হয়। টাকা দিয়ে বৈরাগী সমস্যার সমাধান করে।

এরপর দেখানো হয় এক ভদ্রলোকের বিধবা কন্যা বিশাখা মুসলমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে চলেছে। উপেন্দ্র জানিয়েছে,''*বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের শাস্ত্রে যেরূপ বিধি দর্শায়েছেন তদ্রূপ হলে কি ওর এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত,...*''[৮২] এখানে এক বিদ্যাভূষণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যিনি বিদ্যাশূন্য মানুষদের কাছে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করে। বিধবা বিবাহের সমর্থক অথচ কাজের সময় উৎসাহহীন

কিছু মানুষের বিরুদ্ধেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এবং পরিশেষে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বিধবাবিবাহের বিরোধিতা রূপ অশুভ পরিহার করে বিধবাবিবাহ রূপ শুভকে গ্রহণ করার জন্য। প্রহসনে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে কিছু তির্যক অর্থবোধক ছড়া,—এগুলি অধিকাংশই সমাজে সাধু সেজে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের ছদ্মবেশের মুখোশ উন্মোচন প্রয়াসে উক্ত,—

সমাজপতি প্রসঙ্গে,—"লোকে বলে সাধু সাধুতা ত ভারি।
পাইলে পরের ধন ছলে লয় হরি।''

বৈরাগী প্রসঙ্গে,—"মুচির পুত্র শুচি হয় যদি কপ্নি ধরে।
বেশ্যারাও পূজ্যা হয় শেষ অবতারে।।''[৮৩]

অশোক কুমার মিশ্র আরো জানিয়েছেন, ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তীর *'অশুভস্যকালহরণং'* নাটক। এ নাটকে উঠে এসেছে বিধবার সংকট প্রসঙ্গ। যদিও দুস্প্রাপ্য এ নাটকের আমরা সন্ধান পাইনি। এই নাটকটিকে আলোচনার বাইরে রেখেছি।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট লেখক। বহু গল্প উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত *'বিধবা বিলাস নাটক'* নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। নাটকটি মুদ্রিত হয় শ্রীযুক্ত বেহারিলাল দত্ত দ্বারা শ্রীরামপুর ফ্রেণ্ড যন্ত্রালয়ে। মূল্য দশ আনা।*'বিধবাবিলাস নাটকে'* তিনি সমকালীন এক সমাজ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃত হলেও সমাজে বিধবা বিবাহ নিয়ে সংকোচ ছিল পুরোমাত্রায়। 'বিধবা বিবাহ' আইনত স্বীকৃতি পাবার আট বছর অতিক্রান্ত হলেও বিধবা নারীরা সেভাবে পুনর্বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং সমাজ মানসিকতার বদলও সেভাবে হয়নি।

'বিধবা বিলাস' নাটকের ভূমিকায় বলা হয়েছে,—*''বিধবা বিবাহ প্রস্তাব এক্ষণে অনেকের উচ্ছিষ্ট গলিত বিস্বাদ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট বোধ হইয়াছে। এবং এতৎ প্রস্তাব উপলক্ষে দেশীয় পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় শাস্ত্রীয় বিচার প্রসঙ্গে প্রবর্ত হইয়া তাঁহাদিগের বহুতর আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক যথার্থ মীমাংসা দ্বারা বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাহা নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে শাস্ত্রসম্মত সপ্রমাণ হইলেও অদ্যাপি সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিগণের মন হইতে যে এতৎ প্রস্তাব উপলক্ষে সমুদায় কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে এমত বিবেচনা হয়না। সুতরাং এবিষয় পুনর্ব্বার আন্দোলন করণের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে, কারণ এই গুরুতর বিষয়ে প্রচলিত না হওয়াতে আমাদিগের যে বহু প্রকার অমঙ্গল ঘটিতেছে এবং আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের সমূহ হানি হইতেছে এবং এই শুভকরি প্রথা প্রচলিত*

হইলে যে বিশেষ কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া পুর্ব্বোক্ত অশেষ দোষের মুলোৎপাটিত হইবে যাহা পূর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিগণের মনে নিশ্চয়রূপে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত সহসা এ বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যত হৈবেন না...যদিও অনেক নাটক না-টক, না-মিষ্ট এখন যেরূপ না-টক না মিষ্ট হইয়া পাঠকবর্গের-অরুচিত সুরুচিজনক হইলে শ্রম সকল জ্ঞান করিব।"[৮৪] *'বিধবাবিলাস'* নাটকের শুরুতে নাট্যকার একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করেছেন। প্রস্তাবনা অংশে রয়েছে প্রজাপতির বন্দনা। সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসারে সূত্রধার ও নটীর মাধ্যমে নাটকটির পটভূমি রচিত হয়েছে।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *'বিধবাবিলাস'* নাটকটি ছয়টি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে কোনো গর্ভাঙ্ক নেই। দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি পঞ্চমাঙ্কে তিনটি এবং ষষ্ঠাঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। *'বিধবাবিলাস'* নাটকে একাধিক বিধবা চরিত্র স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিধবা চরিত্রেগুলি হল,—সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী, সুশীলা, সতী, পতিব্রতা প্রভৃতি। উক্ত চরিত্রেরা প্রত্যেকেই পুনর্বিবাহে উৎসাহী।এ নাটকে এমন কয়েকজন বিধবা চরিত্রকে স্থান দেওয়া হয়েছে যাঁরা, পদস্খলনে গর্ভবতী হয়েছেন। পদস্খলিত এই বিধবা চরিত্ররা হলেন,—বিলাসিনী, রঙ্গিনী, কাঞ্চনী, রসবতী প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে, বাঞ্ছারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়, কুলতিলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই বিধবা নারীদের পিতা। মিছেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ হলেন, বিবাহ প্রার্থী বর। এছাড়া রয়েছে, দেশাচার (রাজা), যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য (রাজমন্ত্রী), মদন (প্রতিবাসী) প্রমুখ।

বাঞ্ছারামের দুই বিধবা কন্যা সুমতি ও সুনীতি। একাদশী ব্রত পালতে সুমতি ও সুনীতির জীবন মৃতপ্রায়। একাদশীর হুতাশনে তাদের হৃদয় জ্বলেছে। চোখের জল শুকালেও অন্তরে বাহিত হয়েছে অশ্রুধারা। বয়সোচিত যৌবনধর্মে গ্রীষ্মের প্রখরতার মতই যৌবন জ্বালা তাড়া করেছে। একাদশীর কৃচ্ছ্রতায় সুনীতির বাঁচবার ইচ্ছেটা ক্রমশ হারিয়ে গেছে,—

> *'' সদা জ্বলছে যেন, অগ্নিসম আমারও অন্তর।*
> *জলবিনে নয়নে বহে নিরন্তর।।*
> *অঙ্গক্ষীণ অন্নবিনে, আর যে বাঁচিতে প্রাণে,*
> *একাদশী হুতাশনে, শুখাচ্ছে কলেবর।"*[৮৪]

সুনীতি ও সুমতি দুই বোন একাদশীর যন্ত্রনা ঘোচানোর উপায় খুঁজতে চায়। তাই তারা গঙ্গাজল পাতানো সইয়ের সঙ্গে পরামর্শের কথা ভাবে। অন্যদিকে কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের চার কন্যা সাবিত্রী, সুশীলা সতী ও পতিব্রতা—চারটি কন্যার বিধবা রূপে দগ্ধ হওয়ার পরেও গৃহিনী তাঁর

ছেলের বৌ এর মুখ চেয়ে শান্ত হয়ে সুখী হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিধাতা একমাত্র ছেলেকেও কেড়ে নিয়েছে। যার ফলে চারটি কন্যা ও তার একটি বৌমার ভয়ঙ্কর বৈধব্যদশায় নিরন্তর জ্বলেপুড়ে দগ্ধ হয়েছেন। বিধবা কন্যাগণ ও পুত্রবধূর কঠিন একাদশীর ব্রত পালন দেখে সধবা গৃহিনীর গলা দিয়ে অন্ন নামেনি। ভালোমন্দ খাবারে মুখ দিতে গিয়ে অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছেন।

সাবিত্রী, সুশীলা, সতী ও পতিব্রতাকে তাঁর পিতা কুলীন ব্রাহ্মণের হাতে পাত্রস্থ করেছেন। কিন্তু বালিকা অবস্থায় তারা বিধবা হয়। সমস্ত পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত হয় তারা। কিন্তু যৌবনকালে তাদের রূপের ছটায় ঘর আলোকিত। কিন্তু বিধির বিধানে একাদশী পালন তাদের কর্তব্য। তাই মা হয়ে এ দুঃখ বহন করা অতি কষ্টের। বস্তুত গৃহিনীর হৃদয়বিদারী দুঃখ তৎকালীন সমাজের বহু পিতামাতার হৃদয় নিঙড়ানো দুঃখের প্রতিবিম্ব। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিধবাবিলাস নাটকে' বিধবা কন্যাদের মাতা তথা কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর হৃদয় বিদারিত কান্নার মধ্য দিয়ে কন্যাদের দুর্দশাকে অসামান্যভাবে তুলে ধরেছেন,—

'' পাইলে কুলীন বর, হয়ে অতি তৎপর,
অবিলম্বে দিলেন বিবাহ।
.....
কি কব রূপের কথা, মেয়েগুলি স্বর্ণলতা,
সুবর্ণ নিন্দিত যেন বর্ণ।
.....
নাহিক রূপের সীমা, এসব স্বর্ণ প্রতিমা,
বিধি গড়েছিল কার জন্য।
একাদশী দিনে সবে, কিরূপে এ দুঃখ সবে,
এই ভেবে হই জ্ঞানশূন্য।।''[৮৫]

সুনীতি ও সুমতি তাদের সখীদের সঙ্গে দেখাকরে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেছে। মহাভারত-রামায়ণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের প্রতি একাগ্রতা থাকাটাই বিধবাদের ধর্মীয় শুদ্ধি। কিন্তু সুনীতি ধর্মশাস্ত্রে মন দিতে পারেনি। গ্রীষ্মের দাবদাহে পিপাসার্ত সুনীতির প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্যদিকে নির্জনতা একাকিত্বে বয়সোচিত যৌবনধর্মে বিধবা কুলবালার প্রাণ বসন্ত আগমনীর সুরে সর্বদা

জ্বলেছে। যৌবনতৃষ্ণায় কুলবালা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়েছে। বিধবা সাবিত্রী কুলপ্রদীপের জ্যেষ্ঠ কন্যা। ষোল বছর বয়সে এক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সর্প দংশনে বৃদ্ধের আয়ুক্ষয় ঘটে। সাবিত্রীর প্রাণ তাঁর ছোট বোনেদের জন্য সতত কাঁদে। সাবিত্রীর মত সুমতী ও সুনীতি নারী জন্মকেই দুঃখের জন্ম বলতে বাধ্য হয়েছে। তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছে যে—যদিওবা জন্ম হয় কুলীন ঘরে জন্ম নয়। সরলতা বিধবা হবার পর তাঁর পছন্দের সাজগোজ বাক্সবন্দী হয়েছে। আক্ষেপকরে সরলতা বলেছে,—

"আমরা বিধবা রামা, হয়েছি ঢাকের বামা,
নাহি লাগি কোন শুভ কাযে।" [৮৬]

বিধি যেন নির্জ্জনে বসে অনেক যত্নে সুনিপুণভাবে গড়ে তুলেছে সতীকে। কিন্তু একাদশীর কালনাগ সে রূপের মধ্যে বিষ ঢেলে চলেছে। কাম দহনে হৃদয়ে সতত বয়ে চলেছে ঝড়,—

''কান্ত বিনে রতিকান্ত, দিতেছে যন্ত্রণা।
কিরূপে বাঁচিবে বল, বিধবা ললনা।।" [৮৭]

বিরহ যাতনা, মদন জ্বালায় বিধবাদের জীবন মৃতপ্রায়। আদিম রিপুর কাছে নিষ্ঠার বারংবার পরাজয়ের পর ক্ষুব্ধ বিধবা কন্যাদের অভিযোগ মদনের বিরুদ্ধে। কিন্তু সুমতি জানে, পরাশরসংহিতায় বিধবাদের বিবাহের উল্লেখ আছে। বিধবাদের হিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের পথ উন্মোচিত করলেন। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে তুমুল ঝড় উঠলেও দু-একটি বিধবা বিবাহ হয়। কিন্তু হিন্দু মতব্বরেরা বিধবা বিবাহ প্রদানকারী পরিবারকে হয় একঘরে করেছে নয়তবা দেহশুদ্ধি করেছে। ফলে বিধবা বিবাহের প্রতি মানুষের ভীতি জন্মেছে। বিধবাদের বদলে যাওয়া সৌভাগ্য, ক্রমে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সুমতির কথায়,—

''একঘোরে হোল কেহ, কারো সুদ্ধ হয় দেহ,
চান্দায়ণ প্রায়শ্চিত্ত কোরে।
হায়২ একি দুঃখ, বিধবার হর্ষমুখ
মলিন হইল একেবারে।।" [৮৮]

কামানলে দগ্ধ হওয়া বিধবা রমণীদের আক্ষেপ এই যৌবনকাল নিয়ে। তাই তারা প্রত্যেকে মদনের অর্থাৎ কামানলের জ্বালা থেকে নিজেদের মুক্তির কথা ভাবে। সাবিত্রী, সুনীতি, সুমতি, কুলবালা—প্রত্যেকে দেশাচার অর্থাৎ সমাজের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানানোর কথা চিন্তা করেছে। স্বয়ং বিদ্যসাগর মহাশয় উকিল হয়ে বিধবাদের মনের কথা তুলে ধরতে

পারেন—এই আশায় পত্র লিখিত হয় বিধবা কুলবালাদের দ্বারা। পত্রে আবেদন করা হয়, এই যে যদি রাজা মদনকে শাস্তি দিতে না পারেন তবে যেন বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহের সম্মতি প্রদান করেন। সুশীলা ও কুলবালা শুধুমাত্র বিবাহের নামেই আনন্দে মুখর। তারা পুণরায় নিজেদের সাজিয়ে তুলবার স্বপ্নে মশগুল,—

''দিদি ফিরিবে কপাল।
বিয়ে হবে দুঃখ যাবে ঘুচিবে জঞ্জাল।।
আলোচাল আর খুঁড়ের ডেলে, রাখবো দিদি শীকেয় তুলে,
ইলীব মাচ ঝোলে আম্বলে খাব চিরকাল।।
সাতনরী কণ্ঠমালা, কর্ণফুল আর কানবালা,
ঢাকাই সাড়ী পরে আবার ঝমঝমাব মল।।''[৮৯]

এরপর দেখা গেছে, মহারাজ দেশাচার, যুক্তিশূন্য ভট্টাচার্য, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্রদের নিয়ে রাজসভায় আসীন। মহারাজ ধর্ম নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। এই সময়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে এসেছেন। বিধবাদের আবেদন পত্র রাজার কাছে আনা মাত্রই কৌতুক-হাসি মজার আবহ তৈরি হয়েছে। আবেদনপত্রে যুবতী বিধবারা তাদের মনের দুঃখ কষ্টের কাহিনী লিখেছেন। বিধবা হবার পর, যৌবন কালের জৈবিক চাহিদা তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। বহু বিধবা কুলত্যাগী হয়েছে, আবার কেউ বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

ঋষি পরাশর হিন্দু শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহ দেবার কথা বলেছেন। রামায়ণ, মহাভারতেও এক নারী বহু পুরুষসঙ্গ যাপন করেছেন কিন্তু সতী হয়ে থেকেছেন তারা। তবে বিধবাদের শুধুমাত্র নরক জীবনে ঠেলে দেওয়া কেন? পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে পারে কিন্তু নারীরা সবকিছু হতে বঞ্চিত। নারীর গর্ভে পুরুষের জন্ম, তবে নারীর ক্ষেত্রেই পক্ষপাতিত্ব কেন? নারীরা আকাশ থেকে পতিত হয়নি। একজন পুরুষেরই মত মাতৃগর্ভে তারও জন্ম। তবুও নারী ও পুরুষের নিয়মধর্ম এতটাই আলাদা যা বিধবা নারীদের অভিশাপ স্বরূপ। এই অভিশাপ জীবন থেকে মুক্তি চায় তারা। বিধবাদের বিবাহ দেওয়া হলে কলঙ্কের ভয় থাকবে না। কামাশরে দগ্ধ হয়ে ধর্ম নষ্ট হবে না। বিধবা নারীদের পিতামাতা কন্যার মুখদর্শনে সদা সন্তাপিত হয় এবং কন্যার কলঙ্ক ভয়ে সর্বদা কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন। সংসারের সর্বসুখ বঞ্চিতা বিধবারা অন্যের সংসারের সুখে ঈর্ষান্বিত হয়। যৌবনের চাহিদায় তারা সাড়া দিয়ে কুলত্যাগী হয়। তাই রাজার কাছে তাদের

দাবী,— দেশে পুনর্বিবাহের প্রচলন করার সুবন্দ্যোবস্ত করা। পুনর্বিবাহের মধ্য দিয়ে বিধবারা অভিশাপসম জীবন থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছে।

মন্ত্রী জানিয়েছে, শাস্ত্রে বিধবাদের যে প্রকারের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলা হয়েছে তা বলপূর্বক প্রচলন করা হয়নি বলেই হয়ত বিধবাদের স্পর্ধা এত বেড়েছে। মন্ত্রী তাই রাজামহাশয়কে দুঃখ পেতে বারণ করেছেন। বিধবাদের এরূপ দুর্দশার কারণ জাবার জন্য মন্ত্রীকে পুথির দারস্থ হতে হয়। মিছেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক অবিবাহিত ব্রাহ্মণ বিধবার পুনর্বিবাহ করার জন্য মহারাজের কাছে আসেন। আসেন ঊনচলিশ বৎসরের, হরিদাস ভট্টাচার্য্য। হরিদাস ও মিছেরাম বিধবা বিবাহের উদ্দেশ্যে মহারাজের কাছে নাম লিখিয়ে যায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মিছেরাম জানে, বিধবাদের বিবাহ না হওয়ার কারণে ভ্রুণহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও কুৎসিৎ কলঙ্কঘটনা ঘটে চলেছে সর্বত্র। এসব কিছুর প্রতিকার হিসাবে বিধবা বিবাহই প্রধান অস্ত্র। বিধবাদের বিবাহ হলেই একমাত্র কুলকলঙ্ক লোপ পেতে পারে। মিছেরামের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা দারুনভাবে ফুটে উঠেছে।

সুমতি, সুনীতি, সাবিত্রী, কুলবালা, সতী, সরলতা, সুশীলা প্রত্যেকেই রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তারা তাদের সারাজীবনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা জানিয়েছে। তারা মনে করেছেন, বিধবা হয়ে সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরে যাওয়ার চেয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়া অনেক শান্তির। বিধবাদের যন্ত্রণার কথা বিধবাপক্ষের উকিল মহাশয় উপস্থাপন করেন রাজসভায়। রাজসভায় রাজা, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, বিধবা নারী সমূহ ও বিধবাপক্ষের উকিল উপস্থিত হন। অন্যদিকে যৌবন তাড়নায় পদস্খলিত বিলাসিনী রঙ্গিনী কাঞ্চনী ও রসবতী নামক গর্ভবতী বিধবারা তাদের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজসভায় উপস্থিত হয়। স্বামীহীন সন্তান ধারণের ফলে বিধবা রমণীদের উপহাসের পাত্রী হতে হয় মন্ত্রীর কাছে। শুধু মন্ত্রী নয়, সমাজে নানান লোকের হাসির খোরাকে পরিণত হয় তারা।

রাজার কাছে শ্রীবিলাসী লিখিত আবেদন পেশ করেছে। শ্রীবিলাসী বিবাহে রাজী নয়। সে শুধুমাত্র যৌবন দহে দগ্ধ হয়ে নারীরা যে পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছে সেটা যাতে আর বৃদ্ধি না হয় সে ব্যাপারে রাজামহাশয়কে অবগত থাকতে বলেছে। অতএব, রাজসভায় রাজার হুকুমে মদনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। মদন জানায় যে, সে শুধুমাত্র সুখের খোঁজে মনুষ্য সমাজে বিরাজ করে। স্বামী স্ত্রীর প্রণয় সুখ বিস্তার করাই মদনের একমাত্র অভিপ্রায়। কিন্তু বিধবার স্বামী বিরহের যাতনা অসহ্য হওয়ায় সুখের খোঁজে তারা বিপথগামী হয়েছে। দেশাচারের অত্যাচারের ফলে

বঙ্গদেশে বিধবাদের এমন করুণ পরিস্থিতি। অতএব মদনকে দোষী করা কোন ভাবেই উচিত কাজ নয় বরং বিধবা বিবাহে তৎপর হওয়া আবশ্যক।

রাজা বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দিতে মনস্থির করেন। বিধবাপক্ষের উকিল বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের সপক্ষে জানিয়েছে,—"*...বিধবারা অবিবাহিতা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কলিধর্ম্ম প্রবল হইবার সম্ভাবনা।*" [৯০] তাছাড়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে মন্ত্রী নানা শাস্ত্রের নিয়ম উত্থাপন করলে বিধবাপক্ষের উকিল প্রতিটি শাস্ত্রের শ্লোক ধরে যুক্তি খণ্ডন করে পরাশরের সংহিতার সমর্থনে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমান করেছেন। 'পরাশর সংহিতা'য় বলা হয়েছে,—'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।/পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যে বিধীয়তে।। অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দিষ্ট হইলে মরিলে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব স্থির হইলে ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।' 'পরাশর সংহিতা'র যুক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রী—'আদিপুরাণ', 'ক্রতুসংহিতা', 'আদিত্যপুরাণ', 'বৃহন্নারদীয় পুরাণে' বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কীত নিষেধাজ্ঞার কথা তুলে ধরেছেন।

প্রাজ্ঞ উকিল বিধবা বিবাহের সমর্থনে জানিয়েছে, 'কাত্যায়ন সংহিতায়' বলা হয়েছে, —যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, সে যদি পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছাচারী, সগোত্র দাস, চিররোগী হয় তা হলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্র অলংকারে ভূষিত করে পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা যাবে। অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিধবার পুনর্বিবাহের বিধি আছে। বিধবা বিবাহের বিপক্ষের উকিল বিধবাবিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য পালন উৎকৃষ্ট ধর্ম বলে দাবী করলে। বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিচক্ষণ উকিল বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন,—"*এই ব্রহ্মচর্য্য পরিপালনে অসমর্থা অনেক বিধবার পক্ষে এ ব্যবস্থা স্থাপন আপেক্ষা প্রাণান্ত ব্যবস্থা সহগমন সহস্রগুণে সহজ বোধ হয়। কারণ পঞ্চম বর্ষীয় বালিকার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মরণাপেক্ষা ক্লেশদায়ক এবং অনেকানেক যুবতী বিধবাগণের পক্ষে এই সুকঠিন নিয়ম স্থাপন করাতে তাহাদিগকে কেবল কুলকলঙ্ক বৃদ্ধিসহ কলুষসাগরে নিমগ্ন করা হইতেছে।*" [৯১]

উকিল মহাশয় যথার্থই বলেছেন যে, যে সকল বালিকা বা যুবতী বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত তাদেরই বিবাহ হবে। আত্মীয়, পরিজন, মাতা, পিতা এরাই স্থির করবেন যে, বৈধব্যাবস্থায় তার কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত। যেরকমভাবে প্রথম বিবাহকালে কন্যার বিবাহ দানে মাতা-পিতা, কন্যার মতামত নিয়ে সম্প্রদান করেছেন, দ্বিতীয়বার বিবাহে ও সেরূপ বিচার বিবেচনা করবেন। 'বিধবা বিবাহ' প্রচলিত হলে কুমারীদের বর অপ্রতুল হবে তা

নয় বরং কুমারীদের যে সব পরিত্যাজ্য বর তাদের সঙ্গে বিধবাদের বিবাহ হবে।

মন্ত্রী মহারাজকে সর্বশক্তির দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, বিধবাবিবাহ দেওয়া উচিত কাজ নয়। তাই মন্ত্রী মহাশয় রাজাকে 'বিধবা বিবাহ আইন' চালু না করার পরমর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বিচক্ষণ রাজা মনে মনে বুঝতে পেরেছেন যে, বিধবাদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। সতীদাহপ্রথা রদ হওয়ার ফলে বিধবাদের কষ্টসাধ্য জীবনযাপনে নারীদের দুর্দশার করুণ পরিনতি রাজার কাছে অজ্ঞাত নয়। এই প্রসঙ্গে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী ও উকিলের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে বাক্‌বিতণ্ডা হয়। উকিল মহাশয় বিধবা বিবাহের ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরে বিধবা সমাজকে রক্ষা করার জন্য মহারাজের কাছে কাতর আর্তি জানিয়েছেন। মন্ত্রী মহাশয় সক্রোধে বিধবাদের বিবাহে প্রবল আপত্তি জানিয়ে উকিল মহাশয়কে তার বিধবা ভগ্নী অথবা কন্যাকে প্রথম বিবাহ দেওয়ার কথা বলে তর্কের মাত্রা বাড়ায়। উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে মামলার অগ্রগতি হলে শেষ পর্যন্ত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজা বিচার করেন যে, বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিৎ কাজ নয়। তাছাড়া রাজা অমানবিক ভাবে হুকুম দেন যে বিধবা নারীরা গোপনে পতিবরণ করতে পারবে এবং গর্ভবতীরা গোপনে গর্ভপাত করাতে পারবে। কিন্তু অবৈধতার প্রকাশ হলে দণ্ডিত হতে হবে। আর যারা এই হুকুম অমান্য করবে তারা পিত্রালয়ে একাহারী হয়ে যাবজ্জীবন কাটাবে। প্রায় দশলক্ষ বিধবা যারা পুনরায় বিবাহ করার আশায় আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল রাজ দরবারে তারা রাজার এইরকম সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে এবং গর্ভপাত নিবারণের জন্য যাঁরা প্রথমবার পাঁচশত, দ্বিতীয়বার দুইহাজার এবং আড়াই হাজার দরখাস্ত দাখিল করেছিল তাঁরা ভ্রুণরক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

কাহিনীর অগ্রগতিতে দেখা যায়, তিন মেয়েকে খুঁজে না পাওয়ায়, কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছেন তার তিন মেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। পাড়াপ্রতিবেশী সবাই কুলত্যাগী বলে নিন্দা করেছে। কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী বুকফাটা কান্নার আওয়াজে প্রকাশিত হয়েছে মাতৃস্নেহের প্রকাশ। তিনি জানেন কন্যারা ধর্মনষ্ট করতে পারে না। তাই কন্যাদের কুলটা বলতে তাঁর অন্তর হাহাকার করে ওঠে ক্রমে কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পারে যে তাঁর কন্যারা অপহৃত হয়েছেন। প্রতিবেশী বন্ধুগণের কাছে, তিনি জানিয়েছেন যে, তার রূপবতী কন্যা সতীকে দেশাচার রাজা বন্দী করেছে। দেশাচার তার লোলুপ দৃষ্টিতে সতীর সতীত্ব নষ্ট করতে চাইছে। যে রাজার নিয়মে দাসত্ব স্বীকার করে প্রজারা নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবে, সেই রাজাই যদি হয় ভক্ষক তাহলে বিধবারমণীদের অসহায়তার সীমা থাকে না। ক্রমেই সর্বসাধারণ বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র

পৈশাচিক লোভেই মন্ত্রী ও রাজার বিধবা কন্যাদের পুনর্বিবাহে আপত্তি। ফলে প্রত্যেকের কন্যাধন রক্ষার স্বার্থে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত। কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারেন যুবতী বিধবাদের বিবাহ দেওয়া উচিত,—'' *দেশাচারের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণ পূর্ব্বক বালিকা ও যুবতী বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া সর্বোতভাবে উচিত। এই দণ্ডে মহাশয়েরা একমত অবলম্বন পূর্বক দেশাচারের হস্ত হইতে বিধবাগণকে রক্ষা করিতে প্রস্তু হউন। দেখুন এ বিষয়ে বিলম্ব করার কোন ফল নাই। বরং সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা।*''[৯২] কুলপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি দেশাচারের লোলুপতার শিরচ্ছেদ করে ধরাকে পবিত্র করবেন এবং সেইখানেই আপন বিধবা কন্যাদের বিবাহ দেবেন।

বৈঠকখানার ঘরে রাজা মদন ও গায়কেরা উপবিষ্ট রয়েছে। সতীর আর্তনাদ যাতে অন্দর ভেদ করে বাইরে পৌঁছতে না পারে তার জন্য রাজা গায়কদের চিৎকার করে গান গাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই অংশে সিন্ধু রাগিনী, খেমটা তালের একটি গান সংযোজিত হয়েছে। প্রজাবর্গ দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজাকে আক্রমণ করলে রাজা প্রজাবর্গের হাতে বন্দী হয়। উদ্ধার করা হয় সতীকে। বন্দী রাজার বানিয়ে তোলা মিথ্যে নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে সৈন্যাধ্যক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে তার বিধবা কন্যার বিবাহে সম্প্রদান করার কথা বলেন। শেষপর্যন্ত প্রজাবর্গ বিধবা যুবতী কন্যাদের পুনর্বিবাহ দিয়ে বিধবাদের দুর্দশা মুক্ত করে সমাজকে নিষ্কলুষ করেছে। প্রসঙ্গত উনিশ শতকীয় সমাজব্যবস্থায় বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহ দান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নাট্যকার উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র বিধবাদের পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতায় থেমে থাকেননি বরং নাটকে বিধবাদের বিবাহ দিয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত করেছেন।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর নাটকে উনিশ শতকের সামাজিক সমস্যা প্রধান বিষয় হিসাবে ধরা দিয়েছে। রামনায়ণ তর্করত্ন 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে *'নবনাটক'* প্রণয়ন করেন। *'নবনাটক'* প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। ১৭৮৮ শকাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক এ নাটক মুদ্রিত হয়। মূল্য ১ টাকা। *'নবনাটক'* রচনাকালে নাট্যকার নাটকটির পরিচয় সূত্রে নামপত্রে নাট্যকার লিখেছেন,—*'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 'নব-নাটক'* এবং নাটকটির পরিচয় সূত্রে বিজ্ঞাপন অংশে লিখেছেন,—'' *আমি যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহুবিবাহ বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম। কাব্যকলা-বিনোদী কোবিদবর্গ*

অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন এই আমার প্রার্থনা।"[৯৩] আমাদের আলোচ্য বিধবা কেন্দ্রিক সমস্যা এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় নয়। কিন্তু এ নাটকের এক প্রতিবাদিনী বিধবা নারী চরিত্র নির্ম্মলাকে আমরা পাই। সেকারণে নাটকটি বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। কৌলিন্য ও বহুবিবাহের সূত্রে লগ্ন হয়ে আছে বৈধব্যের প্রসঙ্গ। এ নাটকে তার প্রকাশ রয়েছে।

বিদ্যাসাগর যে সময়কালে বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করছেন সেময়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে বিরাজমান এবং কলকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাসাগরের সহকর্মী হিসাবে অধ্যাপনা করছেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলকে সমর্থন করছেন নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। *'নবনাটককে'* নাট্যকার 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক' বললেও এ নাটকের কাহিনী বৃত্তে তিনি বিধবার সংকট ও সমস্যাকে তুলে ধরেছেন কয়েকটি দৃশ্যে।

সূত্রধার ও নটীর প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। প্রথম অঙ্কে, ভগি ও সাবি দুই দাসীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে। তাদের আলোচনার বিষয়, বার্দ্ধক্যে উপনীত মনিবের দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে। গবেশবাবু গ্রাম্য জমিদার। তিনি নিজেকে গ্রামের ভাগ্য নির্ধাতা মনে করেন। তাকে তোষামোদ করার জন্য চারপাশে ঘুরে বেড়ায় মোসাবের দল। এঁরা হলেন, পণ্ডিতাভিমানী বিধর্ম্মবাগীশ, চিত্ততোষ প্রমুখ। এই মোসাহেবরা জমিদার গবেশের কথাকে ভগবান তুল্য মনে করে। ন্যায় অন্যায় বিচার না করে, অন্ধভাবে গবেশের বক্তব্যকে শিরোধার্য করে কিছু উপঢৌকন লাভের আশায়। পণ্ডিতকে তাঁরা অসম্মান করতেও পিছুপা হননা।

জমিদার গবেশ গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বাধা দিলে, বিধর্ম্মবাগীশ ও চিত্ততোষ এই কাজকে সমর্থন করেন। তাঁরা মনে করেন, স্ত্রীজাতি পড়াশুনা করলে তারা অধর্মের পথকেই প্রশস্ত করে। বিধর্ম্মবাগীশ জানিয়েছে,—"*গ্রাম্যমধ্যে যে একটা অধর্ম্মের অঙ্কুর স্বরূপ স্ত্রী বিদ্যালয় হচ্ছিল, তা হল্যে এতদিন যে একার্ণব হয়ে উঠ্‌তো, ভাগ্যে বাবু সে বিষয়ে লেগেছিলেন তাতে তো হতে পেলে না।*"[৯৪] বিধর্ম্মবাগীশ মনে করেন স্ত্রী জাতির লেখাপড়া করাটা ঘোর অধর্মের কাজ। তাঁর ধারণা,—"*গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও ওটা অধর্ম্ম।*"[৯৫] নাট্যকার যেন ব্যঙ্গের সুরে বলতে চান, স্ত্রীজাতি পড়াশুনো করলে ভয়, স্ত্রীজাতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে ভয়, স্ত্রী জাতি ধর্মচ্যুত হলে ভয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীজাতির উন্নতির সমস্ত পথই যেন অধর্মের। অতএব স্ত্রী জাতির উন্নতির কোনো প্রয়োজন নেই।

'নবনাটকে' মূলত দেখানো হয়েছে, একজন পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারে, তাতে কোন দোষ থাকত পারে না। কিন্তু একজন স্ত্রী এরূপ কার্য কোনদিনও যেন করতে না পারে। বৃদ্ধ গবেশের পুণরায় দারপরিগ্রহকে কেন্দ্র করে নানান মতের উত্থাপন হয়। প্রগতিশীল মনের অধিকারী সুধীর বহু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে,—গবেশ, চিত্ততোষ ও বিধর্ম্মবাগীশের বহু বিবাহের সপক্ষে নানা মিথ্যা যুক্তির মতকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের মত ভণ্ড কুসংস্কারচ্ছন্ন পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা কিছুতেই প্রগতিশীল যুক্তি মেনে নিতে পারেননা। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একাধিক বিবাহ করলে তা সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়। সেই কুলীন ব্রাহ্মণ গত হলে তাঁর একাধিক স্ত্রী বৈধব্য দশায় উপনীত হয় এবং বৈধব্য জ্বালায় জর্জরিত হয়। দুঃখে জ্বালায় বিধবা রমণীরা মনে করতে বাধ্য হয় যে, বিধবা মেয়েদের পক্ষে 'পূর্ব্বে (র) সহগমন প্রথাই মঙ্গলকর ছিল। কারণ বিধবা হয়ে আমৃত্যু পর্যন্ত্য দগ্ধ হওয়ার চেয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় দগ্ধ হয়ে মৃত্যু অনেক শান্তির।

নারীর এই কষ্টও, কুলীনদের ব্যবসার জোগাড়। নারীদের কষ্টে কুলীনদের কিছু এসে যায় না। পয়সা পেলে বিয়ে এবং বিয়ে করে নারীদের উদ্ধার। বিধর্ম্মবাগীশ জানিয়েছেন,—"*তা স্ত্রীদিগের ক্লেশ হলো তা কুলীনদের কি? তাঁরা পয়সা পেলেন বিয়ে করলেন ও ব্যবসায়ই কি মন্দ?*"[৯৬] অর্থাৎ বিবাহ একটি লাভজনক ব্যবসা। যাতে বলি হয় শুধুমাত্র স্ত্রীজাতি। হয় বৈধব্যযন্ত্রণা নয় সতীনকাঁটা—এ সংসারে এ নারীজাতির স্থান নির্ধারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী শুরু হয়েছে, বিমলা, কমলা, চন্দ্র, নির্ম্মলা নামক প্রতিবাসিনীদের গার্হস্থ্য জীবনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। বিমলা, কমলা, চন্দ্র প্রত্যেকেই সধবা কিন্তু সতীনের জ্বালায় জর্জরিত। নির্ম্মলা বিধবা। তাই নির্ম্মলা আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। কমলা ও বিমলার কথপোকথনে উঠে এসেছে নারীজাতির দুঃখের কথা। নারীর জন্মই যেন দুঃখের জন্ম। উনিশ শতকের সময়কালে নারীর জন্মকালেই তার পাত্র খোঁজার জন্য তার পিতাকে ছুটতে হয়। কারণ কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে তারা ধর্মচ্যুত হবে। তাই যেভাবেই হোক কন্যাকে কুলীন পাত্রস্থ করা প্রয়োজন। সে পাত্র বৃদ্ধই হোক আর বহুপত্নীই হোক। কমলার কথায় আক্ষেপের সুর স্পষ্ট,—"*কতো গোহত্যে ব্রহ্মহত্যে করো নারীজন্ম পেয়েছি। আমাদের মত চিরদুঃখিনী কে আছে। চিরকাল মা বাপের গলগ্রহ হয়ো রয়েছি, আমাদের উপর তো মা বাপের অনাদর হবেই, তোরা তো পাঁচ দিন বাদে শ্বশুরঘর কর্‌তে এসেছিস্, তোরাই মা বাপের কাছে কতো আদর পেয়েছিলি? ছেলের উপর মা বাপ যত স্নেহ মমত্ব করেন মেয়ের উপর কি তাদের ততটুকু*

হয়? তেমন হলে অমন হেনস্থায় রাখএবন কেন? তা মা বাপ যে এমন সামগ্রী যারপরনাই, তাঁরা যদি অগ্রাহ্য কল্যেন তবে অন্যে কিনা কর্‌বে বলো?"[৯৭] বাপের বাড়ীতেই মেয়েদের অনাদরে থাকতে হয়। সংসারের বোঝা সরূপ তাদের অবস্থান। কন্যাদের বিবাহ দিতে পারলেই পিতামাতার মোক্ষলাভ হয়। বাড়ীর একটি পুত্রসন্তান যে স্নেহ আদর যত্ন পায় কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে তা কখনোই হয় না। বিবাহের পর বাপের বাড়ীর স্নেহ বঞ্চিতা কমলা শ্বশুরবাড়ীতেও অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে সধবা হয়েও পতিসুখ হারা কমলা স্বামীকে কাছে পায়নি।

কমলার কথায় নির্ম্মলার দুচোখে অশ্রুধারা বয়। নির্ম্মলা বিধবা। স্বামীর সুখ পেয়েও আজ সে বঞ্চিত। নির্ম্মলার স্বামী নির্ম্মলাকে অতি যত্নে রাখত। কিন্তু নির্ম্মলার সুখ ছিল কিছুদিনের। অচিরেই নির্ম্মলাকে বৈধব্যের শিকার হতে হয়। যখনই তার স্বামীর কথা মনে পড়েছে, তখনই সে কষ্ট পেয়েছে। এইসব কথাবার্তার মধ্যে অমলা, বিমলা, কমলা, চন্দ্রকলা তাদের মনের বিভিন্ন রাগ অভিমান দুঃখ জ্বালা একে অপরের কাছে প্রকাশ করে। নির্ম্মলা বিশ্বাস করে, শাস্ত্রানুযায়ী বিধবাবিবাহ সম্ভব। নির্ম্মলা, কমলা ওচন্দ্রকলার কথোপকথনে উত্থাপিত হয়েছে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ,—

> *''কমলা ।। শাস্ত্রে কি রাঁড়ের বিয়ের বিধি আছে সত্যি?*
>
> *নির্ম্মলা ।। তুই দিদি কি বলিস্, শাস্ত্রে নেই? স্বামী মল্যে স্ত্রীর অমনি একেবারে গঙ্গাজলে ধুয়ে খেতে হবে, আর পুরুষ স্ত্রী থাকতেও ১০।২০ যত ইচ্ছে বিয়ে করবে গে, এই বুঝি তোমার শাস্ত্রের বিধি?*
>
> *কমলা ।। না ভাই, শুনিছি সকল শাস্ত্রে রাঁড়ের বিয়ের বিধি নাই। কোন কোন শাস্ত্রে নাকি আছে, তাই মতামতি হয়ে উঠেছে।*
>
> *নির্ম্মলা।। ঐ মতামতিতেই ওদের মাতামাতি, মরুক গে, না হতে দিক্ হবেই এর পর, তবে আমাদের অদেষ্টে হলো না!*
>
> *চন্দ্রকলা ।।...হতো আমাদের হাতে কলম্ তো দেখ্‌তে পেতিস্, কেমন মনের সাধে শাস্ত্র করে ফেল্‌তেম।*"[৯৮]

প্রসঙ্গত উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের একচেটিয়া ক্ষমতা ও রক্তচক্ষুর শাসনে ক্ষত-বিক্ষত বিরুদ্ধে নারী জাতির বিদ্রোহী মনোভাব ফুটে উঠেছে উল্লিখিত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

বিধবা নির্ম্মলা জানে যে, শাস্ত্রে কখনোই পুরুষের কুড়ি-ত্রিশটি বিবাহের উল্লেখ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র সমাজ নিজস্বার্থে বিধবাদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন বিধিনিষেধের বেড়াজাল তৈরি করেছে। তাই যখনই বিধবাদের জীবনে সুখের একটি দিক উন্মোচিত হবার আশা দেখা দিয়েছে তখনই সমাজপতিদের রক্তচক্ষু শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছে। পুরুষজাতির ঘৃণ্যশোষণ প্রণালী শাস্ত্রকে হাতিয়ার করেছে। নির্ম্মলা বুঝতে পেরেছে যে, যতই বাধা আসুক বিধবাদের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হবেই,—"*ঐ মাতামতিতেই ওদের মাতামাতি, মরুক্‌গে, না হতে দিক্ হবেই এরপর, তবে আমাদের অদেষ্টে হলো না!*"[৯৯] এরূপ কথোপকথনের পর নির্ম্মলা, কমলা, অমলা চন্দ্রকলা সকলে গবেশবাবুর অন্দরমহলে প্রবেশ করে। গবেশবাবুর দ্বিতীয় বিবাহে তার স্ত্রী সাবিত্রীর দ্বিমত নেই। কারণ সাবিত্রী গবেশবাবুকে গুরুজন জ্ঞানে মানে। তাই সাবিত্রী তার সতীনকে হাসিমুখেই মেনে নিতে চায়। নাট্যকার রামনারায়ণ *'নবনাটক'* এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, একজন পুরুষের কুড়ি-ত্রিশটি বিবাহের পরিণতি স্বরূপ সমাজ বাল্য বিধবাদের সংখ্যা বেড়েছে ফলে বিধবা সমস্যা নারীজাতির দুর্দশার কারণ হয়েছে। বহুবিবাহ একটি সামাজিক কুপ্রথা, যার ফলে শুধুমাত্র বিধবা সমস্যা নয়, সংকট উপস্থিত হয়েছে নারী জাতির অস্তিত্বে। নাট্যকার সমাজের কুপ্রথাগুলির কুফল চিহ্নিত করেছেন এবং এর প্রতিকারের জন্য সদুপদেশ প্রদান করেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'নবনাটক' প্রথম অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সূত্রে এই নাটক অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রামনারায়ণের 'আত্মকথা' সূত্রে বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,— "*নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকোবাসি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনীত হয়।' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে।*"[১০০] সেকালে প্রভূত সমাদর পেয়েছিল এ নাটক।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সামাজিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু সামাজিক নাটক লিখতে গিয়ে সমকালীন বিধবা বিবাহের বাগ্‌বিতন্ডাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রথম প্রহসন নাটক *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* (১৮৬৬) নাটকের ঘটনাবৃত্তে তুলে ধরেছেন বিধবার সমস্যা, সংকট। যদিও এ নাটক সমাজ পুরোপুরি সমাজ সমস্যমূলক নাটক নয়। কিন্তু এ নাটকের কাহিনী বৃত্তে বালবিধবা ও বয়স্কা বিধবার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার এ নাটক উৎসর্গ করেন বন্ধুবর সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে। *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন,—"*যাহাকে ভালবাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশ মনের*

তৃপ্ততা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দোষ—আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম।"[১০১] বোঝা যায়, নির্দেষ আমাদে প্রদানের জন্য এ নাটক রচিত কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নাটকের কাহিনীবৃত্তে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহের সংকটচিত্র।

দীনবন্ধু মিত্রের *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* প্রহসনধর্মী নাটক। কৌতুকধর্মী এই প্রহসন দীনবন্ধু মিত্রের অপূর্ব সৃষ্টি। বিবাহ বাতিকগ্রস্ত, বৃদ্ধ রাজীবলোচনের আচার-আচরণ ও শাস্তি প্রদান এ নাটকের বিষয়। দুই অঙ্কে রচিত *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* প্রহসন নাটকের প্রথম অঙ্কে, বৃদ্ধ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের নকল বিবাহের ষড়যন্ত্র এবং দ্বিতীয় অঙ্কে, নকল বিবাহ অনুষ্ঠান ও তাকে নিয়ে লাঞ্ছনা-অপদস্থ করা হয়েছে। *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* নাটকের প্রথম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। রাজীব মুখোপাধ্যায়কে জব্দ করাবার উদ্দ্যেশ্যেই সমগ্র ঘটনাটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বৃদ্ধ রাজীবের পুনর্বিবাহের সখ। পুনর্বিবাহ করার পাশাপাশি তার মধ্যে রয়েছে অন্য নানান চারিত্রিক দোষ। যেমন,—কৃপণতা, নারী লোলুপতা, অনুদারতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি। বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বার বিবাহ করবার বাসনায় রাজীব ঘটকের সঙ্গে নানান শলা-পরামর্শ করেছেন। রাজীবের বিধবা কন্যা গৌরমণি ও রামমণির এ বিবাহে প্রবল আপত্তি থাকায় রাজীব তাদের যেমন তীক্ষ্ণভাবে অপমান করেছেন তেমনি, দুই বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছেন।

এহেন বিয়ে পাগল রাজীবকে উচিৎ শিক্ষা দিতে তার শরীরে তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধিয়ে মিথ্যে সাপে কাটার ভয় দেখিয়ে নির্মমভাবে ঝাঁটাপেটা করা হয়েছে। নকল বিবাহের অনুষ্ঠান করে রাজীবের নববধূরূপে ডুমনী, পেচোর মা এবং নবজাত সন্তানরূপে এক শূকরছানাকে হাজির করে রাজীবকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* নাটকে রামমণি ও গৌরমণি এই দুই বিধবা চরিত্রকে আমরা পাই। রাজীব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রামমণি ও গৌরমণি দুজনেই বাল্যবিধবা। বাপের বাড়িতে আশ্রিত রামমণি সারাদিন বাড়ির কাজকর্মে ব্যস্ত থেকেছে। বার্দ্ধক্যে উপনীত পিতার পুনর্বার বিবাহ করবার ইচ্ছায় রামমণি আহত হয়েছে। বৃদ্ধ পিতার কটুবাক্যে রামমণি মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে—"*... পাজী বেটি, দূর হ এখান থেকে, কড়েরাঁড়ী আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, না হয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।*"[১০২] বিধবা রামমণির শ্বশুরবাড়িতে জায়গা হয়নি, বাপের বাড়ীর আশ্রয়টুকু আঁকড়ে ধরে সে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে গেছে নিরন্তর। কিন্তু নিজ পিতার এহেন আচরণে রামমণির বৈধব্য জীবনের কষ্ট দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

একাদশীর মত কঠিন ব্রতের নিয়মে বালিকা বিধবাদের জীবনযাতনা অসহনীয়। গৌরমণি বলেছে,—"*বালিকা বিধবাদের কত যাতনা-একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। একখান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়। দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিন বার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না।*"[১০৩]

একাদশীর নিয়মের ফাঁসে বিধবা রমণীদের সারা জীবন অতিবাহিত হয়। গৌরমণি বুঝতে পারে-এসব ঘৃণ্য নিয়ম মনুষ্যসৃষ্ট। পরমেশ্বর এই নিয়ম সৃষ্টি করতে পারেন না। যদি স্বয়ং পরমেশ্বরের বিধি নিয়ম এরূপ হত, তাহলে বিধবা রমণীদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা সবকিছু মৃতস্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত। বিধবা গৌরমণি যৌবনা। পতিসুখে সুখী হওয়ার বাসনা তার মনে সদা জাগ্রত। তার পুনর্বিবাহ হলে সে স্বামীসুখ পেত। স্বামীর প্রণয়ে বিহ্বল হতে চায় গৌরমণি। স্বামীর মনের মতন করে সেজেগুজে পঞ্চব্যঞ্জনে স্বামীকে ভাত খাওয়ানো, চায়। কখনো প্রতিবেশীদের প্রসঙ্গে স্বামীর সঙ্গে সময় কাটানো ও কৌতুক কথা বলে অহংকার করতে চায় সে। আবার কখনো চায় পুত্রবতী হয়ে পুত্রবধূ ঘরে এনে সুখী হতে। স্বপ্ন দেখে নিজ কন্যার সাধে পাড়া প্রতিবেশীকে পরমান্ন পরিবেশন করতে করতে আপন সুখে সুখী হয়েছে সে। গৌরমণি বলেছে,—"*দিদি! ভাল খেতে ভাল পত্তে, ভাল করে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?*"[১০৪] মনের সুপ্ত বাসনার কাছে হার মেনে গৌরমণি পুনর্বার বিবাহ করতে চায়। কিন্তু ক্ষয়সমাজ বিধিনিষেধে অসহায় হয়ে, নিজ স্বপ্নের অপমৃত্যু দেখে সে নিজেকে পুড়িয়ে আত্মাহত্যা কিংবা সহমরণ যাওয়াকে শ্রেয় মনে করেছে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* প্রহসনে বিধবাদের মনোবিশ্লেষণ সহানুভূতির সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। বিধবা রামমণি ও গৌরমণির বক্তব্যে বিধবাদের যৌন ও আর্থিক সমস্যামুক্তির আর্তি প্রকাশ পেয়েছে,—

"*রামমণি।।* *গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হলে তুই বিয়ে করিস?*

গৌরমণি ।। *আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা, কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না...। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?*

গৌরমণি ।। *দিদি! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না।... দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাঠের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই, তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়।— দেখ দিদি এসব পরমেশ্বর করেননি, মানসে করেচে, তিনি যদি কত্তেন, তঙে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম করে দিতেন।"*

রামমণি ও গৌরমণির কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে বৈধব্যের আর্তি, বেদনা ও যন্ত্রনার অনাবিল করুণ দুঃখসার।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে বিধবা রামমণি গর্জে উঠে জানিয়েছে,—"*অনেক মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তার স্বামী কখন দেখিনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?*"[১০৫] গৌরমণি রামমণির চিন্তাভাবনা থেকে একধাপ এগিয়ে ভেবেছে। গৌরমণি মনে করেছে,—ছোট হোক বা বড় বিধবা বিবাহে কোনো দোষ নেই। পুরুষেরাও স্ত্রীবিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করে। আবার কেউ করে না। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও তাই হওয়া উচিত। ভারতীয় পুরাণেও বিধবাবিবাহের রীতি রয়েছে। রামায়ণে, 'বালি'র মৃত্যুর পর 'তারা' পুণরায় বিবাহ করেছিলেন, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীও পুণরায় স্বামীলাভ করেছিলেন। শিক্ষিত গৌরমণির চিন্তাভাবনার প্রসারে উক্ত প্রহসনটির প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটিতে দীনবন্ধু মিত্র, রামমণি ও গৌরমণি—এই দুই বিধবা চরিত্রদের অঙ্কন করে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কদর্য রূপের খানিকাংশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উনিশ শতকে বিধবাদের দুরবস্থার বর্ণনা খুব স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বিবাহ করার সখের মত, কুমানসিকতাকে রাজীব মুখোপাধ্যায়ের মত চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেমন তুলে ধরেছেন নাট্যকার, ঠিক তেমনি গৌরমণি ও রামমণি-দুই বিধবা চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *'মেঘনাদবধ নাটক'* (১৮৬৭)। *'মেঘনাদবধ নাটক'* পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর রচনা। পৌরাণিক নাটক লিখতে বসে নাট্যকার সমাজ ও সমকালকে উপেক্ষা করতে পারেননি। রাম-রাবণ ও মন্দোদরীর কাহিনী লিখতে বসে সমকালের সমাজ আলোড়নকারী বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বৈধব্যের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে যেতে

পারেননি। *'মেঘনাদ বধ নাটক'* পৌরাণিক নাটক হয়েও গভীর সমকালীনতায় উত্তীর্ণ। উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে নারী এক অবলা জাতি। অবলার গতি হল স্বামী। নারীর যা কিছু শক্তি পিতা ও স্বামীকে ঘিরে আবর্তিত। সে যুগের সমাজ সত্যকে নাট্যকার পৌরণিকতার মোড়কে তুলে ধরেছেন। প্রমীলা তাঁর স্বামী ইন্দ্রজিৎকে হারানোর আশঙ্কায় জানিয়েছে,—

'' অবলার পতি সম নাহি অন্য ধন।
না প্রকাশি পতি পাশে কি আছে বেদন।।
পতির চরণ, করি হৃদয়ে ধারণ,
নাশি দুঃখ অনুক্ষণ।''[১০৬]

'মেঘনাদবধ নাটকে' নাট্যকার ত্রৈলক্যনাথ সহমরণ ও বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গকে কাহিনী বৃত্তে বুনে দিয়েছেন। বীর ইন্দ্রজিতের প্রয়াণের পর পুরোহিত জানিয়েছেন,—*'' কুমারের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কাল নিকট আবার একটা সহমরণের কান্ড আছে, সেটাত সামান্য নয়।''*[১০৭] ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ' আইনত স্বীকৃতি পায়। সমকালীন বাংলা নাটকের কাহিনী বৃত্তে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে বৈধব্যের যন্ত্রণা ও এই যন্ত্রণা মুক্তির উপায় হিসাবে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত *'মেঘনাদবধ নাটকে'* ইন্দ্রজিৎ মারা যাবার পর প্রমীলা বৈধব্যের যন্ত্রণার করুণ অনুভব ব্যক্ত করে শাশুড়ী মন্দোদরী জানিয়েছে,—*'' আর্য্যে! ভেবে দেখুন বিধবা কন্যা আর বিধবা পুত্রবধূর মরণই ভাল। তাদের দেখলে জামাই ও পুত্রের শোক প্রতিদিন নতুন কর্য্যে জ্বল্‌তে থাকে। যখন আমি উপবাসে কাতর হয়্যে শুষ্ক মুখে আর শুষ্ককণ্ঠে প্রাণ পতির উদ্দেশে রোদন কোরবো তখন তুমি কি তোমার মেঘনাদের জ্বালা ভুলবে।...আর্য্যে! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ না করি।''*[১০৮] এভাবেই পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমকালীন বিধবার যন্ত্রণাবোধ, করুণ আর্তি ধরা দিয়েছে।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *'বঙ্গকামিনী'* নাটক। ঝামাপুকুর লেন থেকে, শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা *'বঙ্গকামিনী'* নাটকটি বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এ নাটকের কাহিনীর মধ্যে উঠে এসেছে বিধবার সংকট চিত্র। *'বঙ্গকামিনী'* ছয় অঙ্কে রচিত নাটক। এ নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র কামিনী রূপে গুণে অতুলনীয়। কামিনী, শিক্ষিতা গুণবতী নারী। কামিনীর জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের জন্য তার মাতা জাহ্নবী তৎপর। জাহ্নবী চায় তার কন্যার বিয়ে হোক উন্নত রুচিশীল ইংরেজি জানা কোনো শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে। অন্যদিকে কামিনীর পিতা গদাধর বিদ্যাবাগীশ, যেকোনো পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চান। গদাধর

বিদ্যাবাগীশের বন্ধু মুকুন্দরাম তর্কালঙ্কারের ভাষায়,—"*আরে রেখে দ্যাও হে, মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর থেকে বার্ কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জন্মে কেবল চিরকালটা বাপ মাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বইত নয়। ওদের দ্বারা বাপ মায়ের কি উপকার হোতে পারে? রাত দিন কেবল দ্যাওরে দ্যাওরে! ওদের সঙ্গে কেবল খাওয়ার আর নেওয়ার সম্পর্ক।*"[১০৯]

এদিকে কামিনী তার পছন্দের পুরুষ সত্যশীলকে ভালোবাসে। সত্যশীলও কামিনীর প্রতি দুর্বল। কামিনীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য একটি অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কামিনী ও সত্যশীল দুজনেই বিরহে কাতর হয়। বিরহ যাপনে কামিনী ও সত্যশীলের দেহের কৃষতা দেখা দেয়। অযোগ্য পাত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করে কামিনী। সত্যশীলের ভবঘুরে মন শুধুমাত্র কামিনীকে আশ্রয় করে বাঁচে। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সত্যশীল ও কামিনীর দেখা হয়। কিন্তু সে সাক্ষাৎ সুখকর নয়। সত্যশীল জানে কামিনীর অন্যপাত্রে বিবাহ হয়েছে তবুও সে কামিনীর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয় এবং একসময় প্রবল আত্মগ্লানী অনুভব করে সত্যশীল। আত্মগ্লানিতে সত্যশীলের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি হয় ও মৃত্যু ঘটে। কামিনী সত্যশীলের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। কামিনীর অশ্রুসিক্ত হৃদয়বিদারিত ও মামা শশিভূষণের সান্ত্বনা ও বিলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়।

আমাদের আলোচ্য *'বঙ্গকামিনী'* নাটকে দুজন বিধবা চরিত্র,—'রঙ্গিনী' ও 'মোহিনী'কে আমরা পাই। সধবা ফুলকুমারীর সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে 'রঙ্গিনী' ও 'মোহিনী'র সাক্ষাৎ মেলে। সধবা হয়েও ফুলকুমারীর জীবন করুণ পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিধবা রঙ্গিনী ও মোহিনীর বৈধব্য জ্বালা প্রতিটি মুহূর্তে ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। ফুলকুমারীর স্বামী থাকা সত্ত্বে ও সে জনমদুখী। ফুলকুমারী বাপের বাড়িতে কোন আদর যত্ন পায়নি। বিবাহ পরবর্তী জীবনে সুখ লাভের আশায় জীবন অতিবাহিত করলেও তা পূর্ণ হয়নি। বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়া স্বামীকে নিয়ে ফুলকুমারীর আক্ষেপ চিরন্তন নারী হৃদয়ের বেদনা উদ্ভাসিত,—"*মেয়ে মানুষের সোয়ামীই সব, তা বিধেতা আমাকে তাতেও বঞ্চিত কোরেছেন। যে থাকা না থাকা দুই সমান।*"[১১০] অন্যদিকে রঙ্গিনী বিধবা। বৈধব্য জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জরিত। রঙ্গিনীর আক্ষেপের জায়গাটা আলাদা। রঙ্গিনীর কথাবার্তায়, তার প্রতিটি দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের মর্মবেদনার প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গিনী জানিয়েছে,—"*ভাই, তোর তো তবু আছে, আমি যে একেবারে বঞ্চিত! দেখ, যে অকুল পাঁথারে ভাস্‌চে সে যদি একখান ভাঙ্গা নৌকাও পায়, তবু তার অনেক ভরসা হয়; কিন্তু আমি এ দুঃখের সাগরে রাত্ দিন ভাস্‌চি, নৌকো দূরে থাক্,*

একখান কাঠও নেই, যে তা ধর‍্যে উঠ্যে খানিক হাঁপ জিরুতে পারি।"[১১১] একদিকে রঙ্গিনীর বৈধব্যযন্ত্রণা আর একদিকে ফুলকুমারীর শ্বশুর বাড়ির অবহেলা সমান দুঃখ বহন করে এনেছে দুই নারীর জীবনে। বৈধব্য যন্ত্রণা যে কি—তা বিধবা মোহিনী জানে। তাই সে মনে প্রাণে প্রার্থনা করে, কোন নারীই যেন অকালে বিধবা না হয়। অকাল কুষ্মান্ড স্বামী হোক—তবুও ভালো কিন্তু বৈধব্য যন্ত্রণা যেন সহ্য করতে না হয়। কামিনীর অদৃষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মোহিনী ও রঙ্গিনীর মন ভারাক্রান্ত হয়।

'বঙ্গকামিনী' নাটকে দেখা গেছে, গদাধর বিদ্যাবাগীশের মত সেকালের অভিভাবকেরা —নিজ কন্যাকে বাড়ির জঞ্জাল বলে মনে করতেন। তারা মনে করতেন, বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম এবং আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করবার পর একমুঠো খাবারের প্রার্থনা করাই মেয়ে জাতির ধর্ম। সেকালে অভিভাবকের দ্বারা অপাত্রে কন্যাদান মূলত নারী জাতির অধঃপতন ও বৈধব্য সংকটের আগাম অশনি সংকেতকে বহন করে আনত। সেকথাই নাট্যকার মূলত 'বঙ্গকামিনী' নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় বিপিনমোহন সেনগুপ্তের *'হিন্দু মহিলা নাটক'*। বিপিনমোহন কলকাতা 'আমাস্ট্রীট' হতে ১৮৬৮ সালে বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 'হিন্দু মহিলা নাটক'টি প্রকাশিত হয়। এ নাটকের আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছে,—"*A DRAMA ON THE HINDOO FEMALES ENCOURAGED BY THE LATE JORASANKO THEATRICAL ASSOCIATION. BY BEPIN MOHUN SEN. হিন্দু মহিলা নাটক অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থাব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য। শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত।*" [১১২] বিপিনমোহন সেনগুপ্ত এ নাটক উৎসর্গ করেন তৎকালীন যোড়াসাঁকো নাট্যশালার অধ্যক্ষকে। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছেন,—

"*সবিনয় নিবেদন যেতৎ।*

হিন্দুমহিলাগণের বর্তমান দুরাবস্থা বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করিলে উৎকৃষ্ট রচয়িতাকে মহাশয়েরা দ্বিশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, এই বিজ্ঞাপন "সোমপ্রকাশে" ও ইংরেজী সংবাদপত্রে দৃষ্টি করায় এ নাটকখানি প্রণীত হইল। নাটক লেখা এই আমার প্রথমোদ্যম; এতন্মধ্যে যে ক-একটী সচরাচর ইক্ষিত বিষয় সন্নিবেশিত হইল, তাহাতে বোধ হয় সম্বদয় মহোদয় মাত্রেই প্রাগুক্ত মহিলাগণের হীনাবস্থা সবিশেষ ? করিতে পারিবেন। অভিনয়-অনুপযোগী হওনাশঙ্কায় ইহাতে পদ্যাদি নানা ছন্দ সাধ্যপক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে যে স্থলে দুই একটি না রাখিলে নিতান্ত নাট্যালঙ্কার বিহীন হয়, এমত স্থানেই তত্তাবৎ নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক যদি কিঞ্চিত

পরিমাণেও ইহা আপনাদিগের স্বদেশ হিতৈষী এই সাধিয়সী চেষ্টার কলোপ সম্বন্ধে সাফল্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে স্বীয় বত্নায়াসে পূর্ণাভীষ্ট বোধে সমধিক সুখী হইব নিবেদন মিতি।

সোমড়া বাটী — ভবতামেকান্ত বশ

৩০এ বৈশাখ, শ: ১৭৮৮। — শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্তস্য"[১১২]

*'হিন্দু মহিলা নাটকটি'*র বিজ্ঞাপন সূত্রে জানা যায়, এ নাটকটির পরীক্ষক ছিলেন, সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য। *'হিন্দু মহিলা নাটক'* সাতটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রতিটি অঙ্কে একাধিক গর্ভাঙ্ক রয়েছে। *'হিন্দু মহিলা নাটক'* এক অর্থে উনিশ শতকের সমাজদর্পন মূলক নাটক। বাল্যবিবাহ, বিধবা সমস্যা, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ ও তার করুণ পরিণতি, বিধবাদের পদস্খলন, বেশ্যাবৃত্তি, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয় এ নাটকের কাহিনীবৃত্তে উঠে এসেছে।

এ নাটকের কাহিনীসূত্রে জানা যায়,—কৃপারাম রায় প্রৌঢ়া গৃহস্থ। কৃপারামের দুই পুত্র, প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমার এবং দুই বিধবা কন্যা সুমতি ও গোলাপী। কৃপারামের সহধর্ম্মিনী কমল। প্রসন্নকুমারের দুই স্ত্রী মোহিনী ও শশিমুখী। বসন্তকুমারের স্ত্রী প্রমদা। কৃপারামের বাড়ির যুবতী দাসী সহচরী এবং নাপেতানি হরমণি। *'হিন্দু মহিলা নাটকটি'র* কাহিনী শুরু হয়েছে সাংসারিক কোন্দলের মধ্য দিয়ে। কৃপারামের স্ত্রী কমল ও তার পুত্রবধূ শশিমুখীর সাংসারিক কলহে নারীদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠে আসে। কমল বিশ্বাস করে মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে তারা বিধবা হয়। তাই বিধবা গোলাপীর প্রতি মাতা কমলের কটাক্ষ,—*"লেখাপড়া না শিখ্‌লে আর এমন দশা হয়েছে?"*[১১৩]

সাংসারিক জটিলতার বাইরে গোপালচন্দ্র ও বেণীমাধব—এই দুই ছাত্র মেয়েদের স্কুল স্থাপনে যথেষ্ঠ আগ্রহী। গোপালের শিক্ষিত মস্তিষ্কে জরাজীর্ণ সমাজের কারণ হিসাবে উঠে এসেছে বাল্যবিবাহের কুফল ও বিধবা সংকটের কথা,—*"বাল্য-বিবাহই বিধবা হবার ও ভ্রুণ হত্যার এবং অকাল মৃত্যুর নিদানভূত কারণ, তার সন্দেহ কি?"*[১১৪] বেণীমাধব জানে যে, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অবস্থানুসারে বিধবাবিবাহ প্রচলন স্ত্রীলোকের পরিধেয় সম্বন্ধে নতুন প্রণামী সংস্থাপন, বৈদিকদের পেটে পেটে সম্বন্ধ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করতে পারলে একদিন সমাজ মানসিকতার শ্রীবৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী বংশজ ব্রাহ্মণ নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা মনোরমার বিবাহ উপলক্ষে বিধবা গোলাপীর প্রশ্ন,—*"হ্যাঁগা মনোরমার বিয়ে, মনোরমার*

বয়েস কি, যে বিয়ে দেবে, সম্বন্ধই বা কবে হল; কথায় বলে ওট ছুঁড়ী তোর বিয়ে, এ যে তাই হল দেখি।"[১১৫] বিধবা গোলাপীর মনে মনে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যে ঝড় ওঠে তা নিজভাগ্যের পরিহাসে বহির্ভাগে প্রকাশ্যে চলে আসে। কিন্তু গোলাপীর বিধবা বোন সুমতি অন্য ধাঁচের। সুমতি সাত বছরের মেয়ের বিয়েতে আশ্চর্য নয়। সে অনায়াসে বলে, তিন চার বছর বয়সের মেয়েদের ও বিবাহ খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনশ টাকা পণ নেবে। বিধবা গোলাপীর বিবাহের পরিবর্তে কৃপারাম আড়াইশ টাকা পণ নিয়েছিল। আবার প্রসন্নের প্রথমা স্ত্রী মোহিনীর 'পরিবত্ত' বিবাহ হয়েছিল। উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় 'পরিবত্ত' বিবাহ অর্থাৎ যে পরিবার নিজ পুত্রের বিবাহ দেওয়া হবে সেই বৈবাহিক সম্পর্কে পুত্রবধূর দাদা বা ভাইয়ের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেবার নামই 'পরিবত্ত' বিবাহ। কিন্তু এত আলোচনার মধ্যেও বিধবা গোলাপীর মনে প্রশান্তি নেই। বিরহের দাবানলে যৌবনের তাড়নার কবলে পড়ে সে সততই জর্জরিত।

মনোরমার বিবাহের মণ্ডপে জানা যায় যে, পাত্র ষাট বছরের বয়স্ক প্রবীণ। ফলস্বরূপ নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা পাত্রস্থ করতে বেঁকে বসে। নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ মণ্ডপে আরও ত্রিশটাকা বাড়তি নিয়ে বালিকা কন্যাটিকে তুলে দিতে প্রস্তুত হয় বয়স্ক পাত্রটির হাতে। পাত্রটিকে দেখে গোলাপীর অপছন্দ হয়। কিন্তু মনোরমার পিতা শুধুমাত্র অর্থের লোভে তিন শত ত্রিশ টাকায় নিজ কন্যাকে একটি চোখে চালশে ধরা হাবা (বধির) পাত্রে বিক্রয় করে।

কৃপারামের ছোট ছেলের বউ প্রমদার বয়স বারো উৎরে তেরোয় পড়েছে। কিন্তু সমাজের নিয়মে এই বাল্যবয়সেই মাতৃত্ব লাভ করবার জন্য তার স্ত্রীআচার চলছে। প্রমদা প্রথম রজঃস্বলা হলে কৃপারামের অর্ঘ্যদানের নিয়ম রয়েছে,—'' *আমার ছোট বৌমা অদ্য দুই দিবস হইল প্রথম রজোদর্শন করিয়াছেন, এসময় কালেজ বন্ধ হওয়ায় বসন্তও বাটীতে আছে, ইতিমধ্যেই যাহাতে একটি সূর্য্য অর্ঘ্য দেওয়া, হয় একটি শুভ দিন দেখুন।*"[১১৬]

কলেজের ছাত্র বেণীমাধব নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী ও যুক্তিশীল। একমাত্র লেখাপড়াই নারীজাতির কদর করতে শেখাতে পারে সমাজকে। কিন্তু কৃপারামের মতো লোকেরা নারীদের লেখাপড়া করাকে সম্মতি দেয় না। কৃপারামের ধারণা লেখাপড়া না শিখলে সহজে ব্যভিচারিনী হতে পারবে না এবং শিখলে অনায়াসে চিঠি লিখে পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করবে। তাছাড়া লেখাপড়া শিখে মেয়েরা বিধবা হয়েও একাদশী না করে ঢাকাই শাড়ি পরে সধবার মতো ঘুরে বেড়াবে। বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হলে দেশটা রসাতলে যাবে। নানান তর্কবিতর্কের মধ্য

দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রসম্মত, তা প্রমাণ হলে কৃপারামের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। অন্যদিকে মুখুয্যে বংশের কন্যা সন্তান কামিনী ঘরের বাইরে বের হয়ে যায়। কুলীন কন্যা কামিনীর স্বামীনবু বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবিবাহ করায় কামিনীর কপালে চিরদুঃখ লেখা ছিল। কামিনীর স্বামী কামিনীকে চিনতেও পারত না সঠিকভাবে। বহু স্ত্রীর কারণে কামিনীর স্বামী শুধুমাত্র বিবাহিত স্ত্রীর কাছে পাত্রী স্বামীর মর্যদায় স্থান পেত। কখনো এয়োস্ত্রীটির সুখের কারণ হত না।

কাহিনীর অগ্রগতিতে আমরা দেখতে পাই যে, বালিকা প্রমদা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। তাকে ঘিরে বহু স্ত্রীআচার ইত্যাদি হয়। কামিনীর বেশ্যালয়ে তার কুলীন স্বামীর আগমন ঘটে। কিন্তু বিধির নিয়মে কামিনীকে তার স্বামী চিনতেই পারে না। ধীরে ধীরে কামিনী তার স্বামী নবু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজ পরিচয় দেয়। কামিনী নিজ পরিচয় দিয়ে তার স্বামীকে এটা বোঝতে চায় যে, বহুবিবাহের কারণে বহু স্ত্রীর ভয়ানক ভবিষ্যৎ পরিণতি ঘটছে। নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বহু কুলীন ব্রাহ্মণ বহু বিবাহের ফলে সমস্ত স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাসও করতে পারে না। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় অনেক স্ত্রী গর্ভবতী। নবু বন্দ্যোপাধ্যায় কামিনীর কাছে স্বীকার করে যে, —''*আপনি জানেন না, কুলীদের সন্তানাদি কি সব পিতৃজাত হয়? কখনই নয়।*''[১১৭] অর্থাৎ এয়োস্ত্রীরা যৌবনের ধর্মে স্বামীসঙ্গ না পেয়ে ব্যাভিচারিনী হয় ও গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অনেকে কামিনীর মতো বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। নবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কুলীন ব্রাহ্মণরা ধনলোভে, খাদ্যলোভে বিবাহ করে থাকে। কামিনীর আত্মোপলব্ধির কারণে, তার স্বামীকে অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করার কথা বলে, যাতে তার মতো অন্যান্য স্ত্রীরা মনোকষ্টে দৈহিক চাহিদায় ব্যাভিচারিণী না হয়ে পড়ে। পুরুষশাষিত সমাজে খানিকটা ব্যক্রিমী হয়ে কামিনী নিজে তার স্বামীর অন্নসংস্থানের ভার গ্রহণ করে।

কৃপারাম রায়ের বাড়ির যুবতী দাসী সহচরী। সহচরীর কাছে বিধবা গোলাপী কামিনীর কথা জানতে পারে। গোলাপী, কামিনীর জীবনযাত্রা বিষয়ে আগ্রহী। বিধবার দুর্দশার কবলে পড়ে গোলাপীর অস্থির মন সতত সুখের সন্ধান চায়। গোলাপী সহচরীর কাছে জানতে পারে যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কামিনী সুখেই আছে। সোনার সাতনরী, কাণবালা, ফুলঝুমকো, কোমরে সোনার চন্দ্রহার, দশটাকা দামের শাড়ি প্রভৃতি অলংকারে সজ্জিত কামিনী রূপের ছটায় চারিদিকে আলোকিত। কামিনীর এরূপ সুন্দর জীবনের গল্প শুনে আড়ম্বরহীন, একাদশীর মতো কঠিন ব্রত পালনের মতো নিজ জীবনের প্রতি গোলাপীর ঘৃণা ধরে যায়।

কাহিনীর অগ্রগতিতে আমরা দেখতে পাই যে, বসন্তের স্ত্রী প্রমদা অষ্টমমাসের গর্ভবতী।

প্রমদা নিজশিক্ষা ও গুণের কারণে স্বভাবেও চরিত্রে সুশীলা ও সুন্দরী। গোলাপী প্রমদাকে সম্মান করে। গোলাপী পড়াশুনোর মূল্য বোঝে। কিন্তু আড়ম্বরহীন জীবন থেকে মুক্তি পেতে গোলাপী পরামর্শ করে বেশ্যা কামিনীর কাছে যাওয়ার জন্যে। হর নাপ্তেনীর সঙ্গে গোলাপী পরামর্শ করে বেশ্যা কামিনীর কাছে যাওয়ার জন্যে। অতএব সুযোগ বুঝে হর নাপেতেনীর সঙ্গে গয়নাগাটি নিয়ে গোলাপী কুলত্যাগী হয় ও বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। গোলাপীর বিধবা বোন সুমতি বুঝতে পারে যে, তার বোন গোলাপী কুলত্যাগী হয়েছে। সাংসারিক কাজকর্মে নিপুণা সুমতির কাছে তার মা-বাবা, ভাই ও ভাজের চেয়ে আপন আর কেউ নেই। প্রসন্নের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন সুমতির হৃদয় বিদারিত হয়। বড় বৌ আত্মহত্যার চেষ্টা ও বসন্তের স্ত্রী তের বছর বর্ষীয়া প্রমদার সন্তান প্রসবের সময় অকাল মৃত্যু—এসবের মধ্য দিয়ে সুমতি নিজ স্বপ্নের সংসারের মৃত্যু দেখতে পায়। প্রসন্নকুমারের বড়বৌ মোহিনীর সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় *'সাক্ষাৎ-দর্পণ'* নাটক। নাটকের নামপৃষ্ঠায় নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় না। কোনো এক অজ্ঞাত নাট্যকার দ্বারা এই নাটক রচিত হয়। নাটকটি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। *'সাক্ষাৎ-দর্পণ'* নাটকের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার লিখেছেন,—*"যে সকল ভয়ানক দোষ বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজে প্রচলিত আছে, এই 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকে তাহাই সাধ্যানুসারে বর্ণন করিলাম।"*[১১৮] উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কুপ্রথার প্রচলনের ফলে যে, সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে সমকালীন বহু নাটকে। সমাজের রক্তচক্ষুর শাসনে দুমড়ে যাওয়া নারী ও পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবা সমস্যা, অসহায় নারীত্বের জৈবিক চাহিদা ও পদস্খলন ধরা পড়েছে এ নাটকে।

'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকটি পাঁচ অঙ্কে বিন্যস্ত। এ নাটকের বিষয় বস্তুতে আছে, ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিহর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মোক্ষদার কন্যাদ্বয় কামিনী ও নলিনীর কাহিনী। হরিহর, তাঁর প্রতিবেশী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুবোধের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা নলিনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। কামিনী বিবাহিতা, কিন্তু কামিনীর স্বামী রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের পুত্র দোয়ারি একজন মাতাল, চরিত্রহীন, লম্পট। কামিনী ছোটবেলা থেকেই সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কামিনী ও সুবোধ একে অপরের প্রতি গভীর টান অনুভব করে। তারা একে অপরকে কাছে চায়।

অন্যদিকে, সুবোধ কামিনীর বোন নলিনীকে বিবাহ করতে অপ্রস্তুত। কারণ সে কামিনীকে ভালোবাসে। কামিনী ও সুবোধ পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হলে, কামিনীর দাসী লক্ষ্মীর মধ্যস্থতায় তাদের সাক্ষাত ঘটে। সুবোধ ও কামিনী পরস্পরের সম্পর্ক গভীর হয় ও মনের যত ভাব তারা বিনিময় করে একে অপরের মধ্যে। কিন্তু কামিনীর লম্পট স্বামী দোয়ারী তাদের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে, তরোয়াল দিয়ে কামিনীকে হত্যা করে। সুবোধ রাগে ও শোকে দোয়ারিকে হত্যা করে, নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকে বিধবা চরিত্র হিসাবে নাট্যকার তুলে এনেছেন, রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা বামাসুন্দরীকে। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিধবা বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবনের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাঁর স্বামী হারানোর স্মৃতি চিন্তনের সূত্রে। বামাসুন্দরীর অপূর্ণ জীবনে বারে বারে মৃত স্বামীর স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। বিধবা নারীর শ্বশুর বাড়িতে ঠাঁই হয় না। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় বাপের বাড়িতে। কিন্তু বাপের বাড়িতে আসবার পর জোটে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম। বাড়ির সমস্ত কাজকর্মের পর খাবার জোটে। পরণের কাপড় জোটে ছেঁড়া। মুখ ফুটে কিছু চাইবার অবকাশ নেই, অসুখ বিসুখে বদ্যি নেই, পেট ভরে খাবার নেই—রয়েছে শুধু গঞ্জনা। বিধবা নারীদের দুবেলা ভাত খাবার নিয়ম নেই। লোকের পাতে মাছের মুড়ো, কিন্তু বিধবা নারীকে নিরামিষ শাক-চচ্চড়ি দিয়েই সারাটা জীবন ভাত খেতে হবে। তার ওপর ভয়ঙ্কর একাদশীর নিয়ম। তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও একফোঁটা জল গলায় ঢালা জাবে না অবলা বিধবা রমণীদের। খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোষাক সবকছু বর্জন করার পরেও বিধবা রমণীদের জোটে পায় লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমান।

স্বামীর ছায়ায় বেঁচে থাকা রমণীর জীবন স্বর্গসুখে ভাসে। শ্বশুরবাড়ি অথবা বাপের বাড়িতেও সেই সধবা রমণীর কদর থাকে। কিন্তু বিধবা হবার পর আশ্রয়হীন হয়ে সেই রমণীর যখন পুণরায় বাপের বাড়ির দ্বারস্থ হতে হয়, সেইখানে জোটে অবহেলা, অবমাননা এবং লাঞ্ছনা। *'সাক্ষাৎ-দর্পণ'* নাটকে বামাসুন্দরীর বৈধব্য জীবন বাপের বাড়ির অন্দরমহলে কেটেছে। বাপের বাড়িতে ফিরে এসে, বামাসুন্দরী বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করেছে, নিজের মত ভালো থাকার চেষ্টা করেছে। বাড়ির সবাই দাসীর মত ব্যবহার করেছে বামাসুন্দরীর সঙ্গে। দুঃখ কষ্টের কথা বামাসুন্দরী কাউকে বলতে না পারলেও সে তার বৌদি কামিনীকে ভালোবেসেছে। অবসরে তাঁর মনের দুঃখকথা ব্যক্ত করেছে। এ ভাবেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটক। নাট্যকার *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকটিকে বলেছেন দৃশ্যকাব্য। *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকের কাহিনী সৌদামিনী নামক এক বিধবাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বিধবা হওয়ার কারণে সৌদামিনীর জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়, এ নাটকে। যদিও পরবর্তী সময়ে নাট্যকার সৌদামিনীর স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছেন নাটকের কাহিনীকে মিলনান্ত করার প্রয়োজনে।*'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকটির কাহিনীর পরিধিতে সৌদামিনীর বিধবা হওয়া ও বিধবা পরবর্তীকালীন সময়ের সংকট চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

প্রথম অঙ্কের কাহিনী শুরু হয়েছে শিবপুর বরদাকান্তের বৈঠকখানায়। বরদাকান্ত, গোরাচাঁদ, উড়ুম্বর—প্রত্যেকেই মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যে নানান আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনা থেকে জানা যায়, জাগতিক সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিনিময় এরা মদ খেয়েই করে থাকেন। শিক্ষিত হবার দরুণ সুরাপানকে এরা বুদ্ধিদীপ্ততার লক্ষণ বলে মনে করেন। মাতাল হয়ে এরা মেয়ে মানুষের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন। এই অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, দেখা যায় শিবপুর কমলাকান্তের শয়নঘর। ঘুমন্ত কমলাকান্তের খাট নিয়ে মাতাল গোরাচাঁদ, উড়ুম্বর ও বিধুর যাত্রা ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বেলেল্লাপনা করেছেন। মাতাল হয়ে এরা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। মাতাপিতার সম্মান এরা রাখতে জানে না। মদই এদের ধ্যান জ্ঞান—সবকিছু।

দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী, শুরু হয়েছে শিবপুর হেমাঙ্গিনীর শয়নঘরে, হেমাঙ্গিনী ও যামিনী নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনার মধ্য দিয়ে। একে-অপরকে স্বান্ত্বনা দিয়েছে। নিজেদের স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাদের কপালে যা দুর্ভোগ তা তাঁরা অদৃষ্ট বলেই মনে করে। কামিনীর স্বামী যায় মাতাল গোরাচাঁদ ধূর্ত ও লম্পট। নিজের বিষয় সম্পত্তি মদের নেশায় খুইয়ে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করায় সে মত্ত। তাই সে তার বন্ধুদের মদ খেতে শেখায়। গোরাচাঁদ জানে, মদ খেলে যক্ষা হয়, লিভার নষ্ট হয় এবং তাতে লোকে প্রাণ হারায়। ফলে গোরাচাঁদ বরদাকান্তকে মদ খাইয়ে বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করার ফন্দি আঁটে। বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গোরাচাঁদ 'সৌদামিনী' নামক বিধবা রমণীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানে। মাতাল ও চরিত্রহীন গোরচাঁদ সৌদামিনীকে বাগে পেতে চায়। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠ ভাতৃজায়া সৌদামিনীর প্রতি গোরাচাঁদের লোভী দৃষ্টিভঙ্গি অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। গোরাচাঁদের চারিত্রিক দোষ এতটাই যে, সে তার স্ত্রীকে হত্যা করতেও একমুহূর্ত ভাবে না।

বিধবা সৌদামিনী শিক্ষিতা। কিন্তু সৌদামিনীর জীবন শান্তিহীন। শান্তি বিঘ্নিত হবার

প্রধান কারণ সৌদামিনী পতিসুখ বঞ্চিতা। তাই তার জীবনধারণের ইচ্ছাটাও ক্ষীণ,—"*বিধির বিধানে আমি বিধবা-নবীন জীবনে বিধবা-পাপিনী-অভাগিনী। আমার আর এ পাপজীবন ধারণে কি প্রয়োজন?...বঙ্গ রমণীর এক পতির চরণ কমলই সম্বল, পতিই সুখদাতা—পতিই গতি-পতিই স্বর্বস্ব ধন। সেই হৃদয়রাজ - জীবন রাজপতি বিহনে আমার আর জীবন ধারণে কি প্রয়োজন? কি সুখ?*"[১১৯] প্রতিটি ক্ষণে দুঃখ তাকে হাতছানি দেয়। যে প্রতিনিয়ত পরম করুণাময়ী ঈশ্বরের কাছে নিজ ভাগ্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, আক্ষেপ করে ও হতাশায় দীর্ণ হয়।

এরপর দেখা যায়, বিরাজমোহিনী কর্তৃক সৌদামিনী একটি চিঠি পায়। চিঠিতে গোরাচাঁদের নোংরা প্রস্তাবের ইঙ্গিত পায়। কিন্তু সৌদামিনীর কাছে এই প্রস্তাব কন্টকসম। সে নিষ্কলঙ্ক। ফলে সৌদামিনী ঘর ছাড়ার পরিকল্পনা নেয়। সৌদামিনী বাপের বাড়ী যাওয়ার সাহস পায় না লোকনিন্দার ভয়ে। ফলে সে কাশীতে মাতুলালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দাসী ছদ্মবেশে সৌদামিনী কাশীর পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। হাবড়া রেলওয়ে স্টেশন সন্নিহিত রাজপথ যেখানে সৌদামিনী ছদ্মবেশে কাশী যাওয়ার উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটে বসেছিল, সেখানে ভাগ্যবিড়ম্বনায় সৌদামিনীর সঙ্গে গোরাচাঁদের দেখা হয়। কিন্তু মাতাল গোরাচাঁদ ছদ্মবেশী সৌদামিনীকে চিনতে পারে না। ধূর্ত গোরাচাঁদ সৌদামিনীর মুখের অংশ খানিকটা দেখতে পেলেও সৌদামিনী কৌশলে বাঁচে। লোলুপ গোরাচাঁদের অভব্য ব্যবহার সৌদামিনীকে সহ্য করতে হয়, —"*দেখি শালী! তোর মুখখানা কেমন দেখি।*"[১২০] অদৃষ্টের কৃপায় সৌদামিনী রক্ষা পায় এবং পলায়ন করে।

বরদাকান্তের অত্যধিক মদ্যপানে মৃত্যু হয়। বরদাকান্তের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিধবা হবার শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। বৈধব্য যাতনার ভয়ে, যামিনীর ঘরে ঢুকে হেমাঙ্গিনী আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিধবা সৌদামিনী কাশিবাসী হলে সেখানে বাঙালীটোলায় তার স্বামী শারদাকান্তকে খুঁজে পায়। সৌদামিনী জানত তার স্বামী মৃত। কিন্তু মৃত স্বামীকে পুণরায় জীবিত জেনে সে মুর্চ্ছা যায়। সৌদামিনীর স্বামী দেশান্তরিত হওয়ার পর কোনো খোঁজ না পাওয়ার দরুন সৌদামিনীকে তার বাড়ীর লোকেরা জানায় যে তার স্বামী মৃত। সৌদামিনী তার স্বামীকে পুণরায় ফিরে পেয়ে হারানো সুখ ফিরে পায়। কাহিনীর অন্তিমে দেখা যায়, গোরাচাঁদ বিষ খেয়ে মারা যায়। সৌদামিনী তার স্বামীকে ফিরে পায়। স্বামীর মৃত্যুর খবরে বিধবা সৌদামিনীর দাঁতে মিশি পড়েনি। দুধ জল ঘি খেয়ে দিন কাটাতো সে। নিয়মাচারে বদ্ধ সৌদামিনী স্বামীকে ফিরে সে মুক্ত জীবনচারী হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত সৌদামিনী ও শারদাকান্তের মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি হয়।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকটিতে উনিশ শতকের সামাজিক অবক্ষয়ের একটি দিক হিসাবে 'মদ্যপান'কে দায়ী করেছেন। মদ্যপানের কারণে ঘরে ও বাইরে নানান সমস্যার দিকটি উন্মোচন করেছেন। সেইসঙ্গে বৈধব্য যন্ত্রণা ও বিলাপ সৌদামিনীর মত বহু বিধবা নারীর জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকে বিধবা সৌদামিনীকে ভোগ করার তাড়না দেখা যায় মাতাল গোরাচাঁদের মধ্যে। সৌদামিনীর সতীত্বকে নষ্ট করতে গোরাচাঁদের লক্ষ্য স্থির। যার ফলে বিধবা সৌদামিনীকে বহুকষ্টে ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে হয়েছে। মূলতঃ নাট্যকার বিধবা সৌদামিনীর দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। সমাজের কিছু স্বার্থপর মানুষের স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার। সৌদামিনীর বৈধব্য অবস্থায় তার দুঃখ ও স্বামী ফিরে আসার পর তার সুখ অর্থাৎ দাঁতে মিশি লাগাবার প্রতীকী ব্যঞ্জনাটি *'বিধবার দাঁতে মিশি'* নাটকে ব্যপ্তি লাভ করেছে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের '*শরৎ সরোজিনী*' নাটক। 'দুর্গাদাস দাস প্রণীত' এই ছদ্মনামে গ্রন্থাকারে এ নাটক প্রকাশ করেন উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৮৭৬ সালে উপেন্দ্রনাথ দাস ইংলণ্ডে থাকাকলীন 'শরৎ সরোজিনী' নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বদেশপ্রেমী সৎ আদর্শবান দয়ালু জমিদার শরৎকুমার দত্ত ও তাঁর বাড়িতে পালিত কন্যা সরোজিনীর কাহিনী অবলম্বনে *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকটি রচিত। জমিদার মতিলাল দে শরৎকুমারের শত্রু। চারিত্রিক দিক দিয়ে লম্পট, লোভী, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর মতিলাল দে আনরপুর গ্রামের জমিদার। পতিপরায়ণা বিন্দুবাসিনী মতিলালের স্ত্রী। কিন্তু লম্পট মতিলাল বিন্দুবাসিনীকে ছেড়ে পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ। বিধবা ভুবনমোহিনীর সতীত্ব কেড়ে নিয়ে মতিলাল তাঁকে রক্ষিতা করে রেখেছে। বিধবা ভুবনমোহিনীর জীবনের করুণ পবিনতি মতিলালের লোলুপ দৃষ্টিতে সদা উজ্জ্বল। মতিলাল তার আশ্রিত যুবক বিনয়ের কাছ থেকে ছল করে সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে করে নেয় ও বিনয়কে প্রাণে মারবার কৌশল করে। অসহায় বিনয় পালিয়ে গিয়ে কলকাতায় শরৎকুমারের আশ্রয়ে ঠাঁই পায়। পরোপকারী, দেশপ্রেমিক শরৎ বিনয়কে তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। শরৎকুমারের বোন সুকুমারী ও বিনয়ের মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অপরদিকে, লম্পট মতিলাল শরৎকুমারের বোনের প্রতি লোলুপ হয়ে তাদের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ভুবনমোহিনীর কল্যানে বিনয় ও সুকুমারী রক্ষা পায়। মতিলালের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে, শরৎকুমার মুসলমানী প্রজাদের দ্বারা অপহৃত হয় ও বহুদিন পর নিস্তার পায়। সরোজিনী তার প্রণয়ের কথা মনে চেপে রাখে। সে শরৎকুমারকে ভালোবাসে। কিন্তু জানাতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে

যায়। বহুদিন পর সরোজিনীর শোকে পাগল শরৎকুমারে কাছে ছদ্মবেশে ফিরে আসে সরোজিনী। বিনয়-সুকুমারী ও শরৎ সরোজিনীর মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের বিধবা চরিত্র 'ভুবনমোহিনী'। সমাজের চোখে ভুবনমোহিনী অসতী। অসতী বলেই সে একঘরে, কোনঠাসা। বিধবা ভুবনমোহিনী যখন পুত্রতুল্য বিনয়কে কাছে ডাকেন তখন বিনয় স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিধাগ্রস্থ হয়। মতিলালের লোলুপ দৃষ্টিতে ভুবনমোহিনী সতীত্ব হারায়। কিন্তু সমাজের চোখে মতিলাল নির্দোষ, ভুবনমোহিনী দোষী। বিনয় ভুবনমোহিনীর কাছে যেতেও ঘৃণা বোধ করে। সমাজ ভুবনমোহিনীকে মতিলালের 'রক্ষিতা' বলে আখ্যা দিয়েছে। শরৎকুমারের বিমাতা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ফলে শরৎকুমার বিমাতাকে হীন দৃষ্টিতে দেখত। ভুবনমোহিনীর সঙ্গে দেখা করার সুবাদে সমাজে শরৎকুমারের বিমাতার চরিত্র নিয়ে নানান প্রশ্নে শরৎকুমার বিচলিত হয়ে বিমাতাকে পাপীয়সী বলতে দ্বিধা করেনি,—"*ভুবনমোহিনী বলে একটা রক্ষিতা স্ত্রী আছে। তার বাড়িতে পাপীয়সী যাওয়া আসা করতে লাগল। লোকে কানাকানি আরম্ভ করলে।*"[১২১]

অসহায় বিধবা ভুবনমোহিনী লোকসমাজে বেশ্যায় পরিণত হয়। ফলে ভুবনমোহিনীর সঙ্গে যারা দেখা করতে যায় তারাও অসতী ও ভ্রষ্টা রূপেই আখ্যা পায়। শরৎকুমারের বিমাতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি কোথাও তার ঠাঁই হয়নি। কিন্তু ভুবনমোহিনী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। সে চায় তার অপরাধীকে শাস্তি দিতে,—"*এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, (দন্তঘর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান করে আমার মেয়েজন্ম সার্থক করব।*"[১২২] ভুবনমোহিনী ছল করে মতিলালের বুকে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, সে মতিলালকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে। সমাজের কটুক্তি, হেয়জ্ঞান, নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপেও ভুবনমোহিনী ভেঙে পড়েনি। সে শুধুমাত্র লম্পট মতিলালের চরম শাস্তি চায়। নিজহাতে মতিলালের জীবনের চরমতম সর্বনাশ ডেকে এনে তাকে শাস্তি দিতে চায়। লম্পট মতিলাল ভুবনমোহিনীর সর্বনাশ করার পর পুণরায় অন্য নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয়। মতিলাল স্বগত ভাষণে জানিয়েছে,—"*ভুবনমোহিনীকে আর ভাল লাগে না। চিরকাল কি একজনকে ভালবাসা যায়?*"[১২৩] লম্পট মতিলালের মত মানুষদের নিজ কন্যাসম নারীর প্রতিও কামবাসনা জাগে। বিকৃতমনস্ক লম্পট মতিলালের মত মানুষেরা বিধবা নারীদের ভোগের সমাগ্রী হিসাবের দেখে। বিধবা নারীদের হস্তগত করে, ফুসলিয়ে ভ্রষ্ট করার মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ করে। প্রতিশোধে বিধবা ভুবনমোহিনী, মতিলালের সর্বনাশের পথ খোঁজে। ভুবনমোহিনী সুযোগ বুঝে কিরীচ দিয়ে মতিলালকে আঘাত করে হত্যা করে ও

প্রতিশোধ নেয়। শেষে নিজেও কিরীচ দিয়ে নিজ বুকে আঘাত করে মৃতুশয্যায় শায়িত হয়। একজন প্রতিশোধপরায়ণা বিধবা নারীর জীবনের করুণ পরিণতি এ নাটকে নাট্যকার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকটি বহু পত্র-পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রতিধ্বনি, সোমপ্রকাশ, সাপ্তাহিক সমাচার, সাধারণী, হাবড়া হিতকারী, এডুকেশন গেজেট, ভারত সংস্কারক, সহচর, আর্য্যদর্শন, মধ্যস্থ, বান্ধব, ঢাকাপ্রকাশ এসব পত্রিকায় *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকটি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৫ সালে, ২, ৩, ২৩ জানুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। সমালোচক শঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন,—*''এই সময়েই গোলাপ বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকে 'সুকুমারী'-র ভূমিকাভিনয়ে গোলাপ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে বাঙলা নাট্যজগতে সুকুমারী নামে পরিচিত হয়ে পড়েন। উপেন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে গ্রেট ন্যাশনাল দলেরই অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে সুকুমারীর তিন আইনে বিবাহ হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এখান থেকে গোলাপের নাম হয় নাম হলো সুকুমারী দত্ত।''*[১২৪] ১৮৭৫ সালে ১৫ই মে, *'শরৎ সরোজিনী'* নাটকটির অভিনয়ের পর উপেন্দ্রনাথ দাস 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে'র নাট্যমঞ্চ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্তী কালে এই নাটকটি ১৮৮৫ সালের ১৪ই আগষ্ট 'দি ইণ্ডিয়ান (লেট গ্রেট) ন্যাশানাল থিয়েটারে' পুণরায় মঞ্চস্থ হয়।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন, কলকাতার যুবক রিফর্মারদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। উপেন্দ্রনাথ 'র‍্যাডিক্যাল লীগ' স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ১৮৭৬ সালে গ্রেটন্যাশানাল থিয়েটারে *'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'* অভিনয়ের জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের বিরাগ ভাজন হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বাংলা নাটকে রাজদ্রোহের ঘটনায় ভীত হয়ে ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ সালে' অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করেন। উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক। ১৮৬৮ সালে উপেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর প্রয়াণ ঘটে। এরপর উপেন্দ্রনাথ এক নিম্নজাতির বিধবা স্ত্রীলেককে বিবাহ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *'আত্মচরিত'* গ্রন্থে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'বিধবা বিবাহ' সম্পর্কে লিখেছেন,—*''এক দিন দুপুর বেলা উপেন কতিপয় বন্ধুসহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল. এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "তুমি শুনে সুখী*

হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি ক'রে আন্‌তে হবে। তার মায়ের মত আছে; কিন্তু মামা অভিবাবক, তাঁর মত নাই।...তৎপর দিন খিচুরী বিবাহ হইল। এরূপ শোনা গেল, মেয়েটি কায়স্থজাতীয়া; যদিও পরে জানা যায় যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া। কায়স্থদের' কন্যা ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহ করিলে আইনসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে পুরোহিত ও ঠাকুর আসিয়া একটা বিবাহক্রিয়া হইল।''[১২৫] নাট্যকার নির্দেশক অভিনয় শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীনাথ দাসের পুত্র। শ্রীনাথ দাস ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট বন্ধু। 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ করার জন্য শ্রীনাথ দাসের দ্বারা ত্যাজ্যপুত্র হন। বিদ্যাসাগর শত চেষ্টা করে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটাতে পারেননি।

১৮৭৫ সালে একটি নাটক প্রকাশিত হয়, অজ্ঞাতনামা রচিত *'বিধবা বঙ্গবালা'* নাটক নাটকটি আমাদের হাতে আসেনি। তাই এ নাটকটিকে আমরা আমাদের আলোচনার বাইরে রেখেছি।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত *'সন্তাপিনী নাটক'*। আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন, *'চির সন্ন্যাসিনী'* (১৮৭২) নাটক রচয়িতা লক্ষ্মীমণি দেবী *'সন্তাপিনী নাটক'* (১৮৭৬) এর রচয়িতা। সমকালে অনেকে এই নাটকটিকে পুরুষের বেনামী রচনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। সুকুমার সেন সন্দেহ নিরসন করে লিখেছেন,—*''মেয়েলি ছড়ার ছড়াছড়ি এবং নারীসুলভ বাগ্‌ভঙ্গি হইতে মনে হয় যে রচনাটি মেয়েরই হাতের, পুরুষের বেনামি নয়।''*[১২৬] *'সন্তাপিনী নাটক'* বিধবা বিবাহের পক্ষে রচিত। পুনর্বিবাহিতা নারীর সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাঁদের সন্তান ধারণের ছবিকে বাঙ—ময় করে তুলেছেন নাট্যকার। দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীকে এই নাটক নিবেদন তথা উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী ১৭ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তিনি কাশীম বাজারের কুমারের স্ত্রী ছিলেন। ১৮৪৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণী তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তি অধিকার করে নিলে স্বর্ণময়ী আইনী লড়াই লড়ে স্বামীর হৃত সম্পত্তি ফিরে পান। অতীব দানশীলা স্বর্ণময়ী দেবী বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে অর্থসাহায্য করেছিলেন।

বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী পত্রিকায় *'সন্তাপিনী নাটক'* এর গ্রন্থ সমালোচনায়

লেখা হয়,—"*সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক যত পুস্তক প্রণীত হয় ততই আমাদিগের গৌরবের বিষয়। এই নাটকখানির উৎসর্গ পাঠে আমরা জ্ঞাত হইলাম, এখানি উক্ত ভদ্রমহিলার দ্বিতীয় উদ্যম। নাটকের ভাষা উত্তম বলিতে হইবে এবং স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের দুই একটি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু আমরা পুস্তকখানি নাটকোচিত গুণবিশিষ্ট বলিতে পারি না। আরা গ্রন্থকর্ত্রীকে অনুরোধ করি, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ অধিকার আছে, তাহাতে তিনি যদি নাটক না লিখিয়া অন্যান্য বিষয়ে লেখনী চালন করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদরণীয় হইতে পারে।*"[১২৭]

মেয়েলি ছড়া ও সহজ কৌতুকে এ *'সন্তাপিনী নাটক'* রচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈষৎ ব্যঙ্গের ঝাঁজ। মূলত পুরুষের বহুবিবাহকে সমালোচনা করে *'সন্তাপিনী নাটক'* রচিত। *'সন্তাপিনী নাটক'* তিন অঙ্কে বিন্যস্ত। মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জমিদার পুত্র নবকুমার ও সিন্ধুবালার (সন্তাপিনী) বিবাহ, বিচ্ছেদ ও সিন্ধুবালা কর্তৃক নবকুমারের নৈতিক উপদেশ প্রদান প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সিন্ধুবালা (সন্তাপিনী) এ নাটকের নায়িকা। প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, নবকুমারের নৌকাডুবি হলে এবং নবকুমার গভীর বনে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে এক চামুণ্ডা কাপালিকের হাতে বন্দী হয়। চামুণ্ডার নিত্য সেবিকা সিন্ধুবালা কর্তৃক নবকুমার মুক্ত হয়। কৃতজ্ঞতাবশত এবং সিন্ধুবালার রূপে মুগ্ধ হয়ে নবকুমার তাকে বিবাহ করে। এই কাহিনী অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'কপালকুণ্ডলা'* (১৮৬৬) উপন্যাসের অনুসারী। এরপর দেখা যায়, নবকুমার পিতার ভয়ে বাড়ি ফেরার পথে নবকুমার (প্রথম পত্নী) বনবাসিনী সিন্ধুবালাকে জাহাজ থেকে ঠেলে জলে ফেলে দেয়। বাড়ি ফিরে নবকুমার পিতার নির্দেশে পুণরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এর পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি আখ্যানে দেখা যায়, নবকুমারের পিতার বন্ধু, ইন্সপেক্টর বিশ্বেশ্বর তাঁর প্রথমা পত্নী বিরাজমোহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য পাটনা হতে পত্নীর আত্মীয়ার এক বাল্যবিধবা কমলিনীকে বিয়ে করে ঘরে আনেন (নাটক রচয়িতার মতে আঁতুড় ঘরের বিধবা)। ধনী পিতার কন্যা কমলিনী শৈশবে বিধবা হলেও বাল্যকাল থেকে বাবা-মায়ের যত্নে লালিত পালিত হয়েছে। একাদশীর নির্মমতা কিংবা অর্থকষ্টের নিদারুণ দারিদ্রে তাঁর জীবন পীড়িত হয়নি। বিধবা, কমলিনী শিক্ষিতা। কমলিনীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্বেশ্বরকে আকর্ষণ করেছে। বিশ্বেশ্বর ও কমলিনীর বিয়ে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোন মতেই হয়নি। তাঁদের বিয়ে হয়েছে গান্ধর্ব মতে। পাটনা থেকে বিধবা কমলিনীকে বিবাহ করে এনে তাঁকে পাটরাণী করে তুলেছেন

বিশ্বেশ্বর। কমলিনী, স্বামীর প্রিয়। রূপে গুণে, বিদ্যায় সতীত্বে, পবিত্রতায়, ভক্তিতে সে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। নাট্যকার বিধবা বিবাহের সুফল দেখিয়েছেন, কমলিনী ও বিশ্বেশ্বরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শয়নকক্ষে কমলিনী ও বিশ্বেশ্বরের প্রেম অভিমান ও কৌতুক স্নিগ্ধ এক ছবি এঁকেছেন এইভাবে,—

''কমলিনী ।।'জীবিতেশ্বর! মেঘের বারি ভিন্ন অন্য বারিতে চাতকিনীর পিপাসা দূর হয়না।

বিশ্বেশ্বর ।।'সুন্দরী' কোন উদ্যানের মধ্যে বিবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত থাকলেও কেবল কমলিনীতে ভ্রমরের যথার্থ প্রীতি, তা প্রিয়ে, তোমার প্রতি আমার সেইরূপ তোমাকেই আমি...।'

কমলিনী ।।'নাথ এবড় হাসির কথা, আমি দর্শন মাত্রেই জীবন যৌবন মন প্রাণ সর্বস্ব যাকে সমর্পণ করেছিলাম, এখন উল্টে সেই কথা তিনি বলেন।''[১২৮]

গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা বিধবা কমলিনী দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে গর্ভধারণ করেছে। বিধবা বিবাহ করার কারণে বিশ্বেশ্বরকে সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। পুনর্ভু কমলিনী স্বামীর গরবে গরবিনী হয়েছেন। মেয়েমহলে শুনতে হয়েছে নানান কানাকানি। বিশ্বেশ্বরের প্রথম পত্নী বারবার চক্রান্ত করেছে বিশ্বেশ্বরের সতীন কমলিনীর বিরুদ্ধে। কারণ স্বামীর সব স্নেহ ভালোবাসা দ্বিতীয় স্ত্রীর পতি। এ সহ্য হয়নি প্রথম পত্নী বিরাজমোহিনীর। সে বারবার চক্রান্ত করেছে কমলিনীকে স্বামীর কাছে চক্ষুশূল করে তুলতে।

এরপর দেখা যায়, বিশ্বেশ্বরের প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় কমলিনী গৃহত্যাগ করেছে। প্রথম স্ত্রীর খল চাতুরীতে বিশ্বেশ্বর দ্বিতীয় স্ত্রীকে সন্দেহ করেছেন এবং 'কুলটা' বলতে দ্বিধা করেননি। সমকালে বিধবা বিবাহের পর পরিবারে নানা সংকট উপস্থিত হত সেই করুণ ছবিই নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই অংশে। দৃঢ়তাহীন পুরুষের প্রেম অল্প আঁচেই গলে যায় দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। ভীরু অশক্ত কাপুরুষ ব্যক্তিবর্গের এ হেন আক্ষেপ সমকালের দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই চিনিয়ে দেয়। পুরুষের এহেন আচরণকে সমালোচনা করেছেন নাট্যকার। পুরুষমহলে তৈরি হয়েছে নানা কৌতুহল। প্রলোভনের জাল বিস্তার হয়েছে বহুধায়। মেয়ে মহলে বলতে শোনা গেছে, 'মিটমিটে ডান', 'ছেলে খাবার রাক্ষস' প্রভৃতি অপবাদ। উনিশ শতকে সমাজ অন্তঃপুরে চালু ছিল মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দিলে, সে মেয়ে অকালে বিধবা হয়, কুলটা হয়, কুপথে পা পাড়ায়। সেই প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে এই অংশে।

নাটকের মধ্যপর্বে দেখা যায়, প্রবল অনাদর সত্ত্বেও জলমগ্ন সিন্ধুবালা ফিরে এসেছে তাঁর স্বামী নবকুমারের কাছে। স্বামী তাঁকে খুন করতে চেয়েছে জেনেও সিন্ধুবালা (সন্তাপিনী) হিন্দু পতিব্রতার সংস্কারে স্বামী সান্নিধ্যে এসেছে। কিন্তু স্বামী নবকুমারকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে দেখে প্রতিবাদে গর্জে উঠে সিন্ধুবালা জানিয়েছে,—"*আপনি বিবাহ করেছেন, আমাকে যদি শত শত বার সমুদ্রে ফেলিতেন, তাহাও অধিনীর সুখ, কিন্তু একটি বিবাহ অসহ্য, এজন্য পুনর্বার বনবাসিনী হইলাম।*"[১২৯] বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, নাট্যকার নারীর প্রতিবাদকে উচ্চকিত করেছেন সিন্ধুবালার মধ্য দিয়ে।

এরপর দেখা যায় গৃহত্যাগী সিন্ধুবালা ও কমলিনীর সাক্ষাৎ। কমলিনীর দুঃখকথা শুনে সিন্ধুবালা প্রবল আত্মাভিমানে পুরুষজাতির এহেন আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে জানিয়েছে,—"*...পুরুষ মানুষ সকল স্থানেই এইরূপ, খল, কপট, দুর্জ্জন। ছল চাতুরি মাখান সকল পুরুষ মানুষ দেখিতে পাই, যে স্ত্রীলোক বড় ভাগ্যবতী সেই স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করিতে পায় সেও দুশোর মধ্যে দশটা।*"[১৩০] সামাজিক অসাম্য পুরুষের তৈরি। পুরুষ নিষ্ঠুর খল চতুর। পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্রুপ বিদ্বেষ জানিয়েছে সিন্ধুবালা। সিন্ধুবালার মধ্যস্থতায় বিশ্বেশ্বর নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং কমলিনীকে সাদরে গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বরের স্বগতোক্তিতে নাট্যকার সমকালীন সমাজের পুরুষের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বেশ্বর স্বগতোক্তি করে জানিয়েছে,—"*উঃ পুরুষ মানুষ কি নৃশংস...কেবল স্ত্রীলোককে শাসন করতে পারি, সুখী করতে পারিনা।*"[১৩১] এভাবেই নাটকটি মিলনান্তক ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বস্তুত বিধবা কমলিনীর দুর্দশার কারণ হিসাবে তাঁর স্বামীর চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবকে দায়ী করেছেন নাট্যকার।

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের *'বিধবা'* নাটক ও রাধারমণ করের *'সরোজা'* নাটক। এ দুটি নাটকে উঠে এসছে বিধবার সংকট চিত্র। নাটকদুটি আমাদের সন্ধানে আসেনি তাই নাটক দুটির আলোচনা হতে আমরা বিরত থেকেছি।

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'এমন কর্ম্ম আর করব না'* নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন, ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের '*Le Bourgeois Gentilmme*' নাটক অনুসরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ *'এমন কর্ম্মআর করব না'* নাটকটি রচনা করেন। নাটক হিসাবে *'এমন কর্ম্ম আর করব না'* রঙ্গনাট্য বা *'Comedy of manners'* গোত্রের। ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে *'এমন কর্ম আর করব না'* নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১০ সালে এ নাটক নাম বদলে *'অলীকবাবু'* নামে প্রকাশিত হয়।

'এমন কর্ম্ম আর করব না' নাটকে 'অলীকপ্রকাশ' চরিত্রে উনিশ শতকের সমাজবিন্যাসে 'সর্ববিদ্যাপারঙ্গম' এক ভন্ডের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বাড়ি কেনা অলীকপ্রকাশের কাছে কোন সমস্যাই নয়। নিজের দু-তিনখানা বাড়ি আছে—এরূপ বড়াই করতে অলীকপ্রকাশকে শোনা যায়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকৃত অনুকরণ আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ ফুলে ওঠা বাবুদের ভ্রান্তিকে নাট্যকার দেখিয়েছেন অলীকবাবু চরিত্রে। সত্যসিন্ধু বাবু যখন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হতে যাচ্ছেন তখন গদাধর নিজের মুখোশ খুলে ফেলে অলীকপ্রকাশের মিথ্যা সবকিছুকে অকপটে জানিয়েছে এবং স্বীকার করেছে *'এমন কর্ম্ম আর করব না'*।

এ নাটকের কাহিনীতেদেখা যায় কৃষ্ণনগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা হেমাঙ্গিনীর বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজছেন। সত্যসিন্ধু তাঁর শিক্ষিত, সুন্দরী ও অতি আদর যত্নে বড় করে তোলা একমাত্র কন্যার জন্য সুযোগ্য ও সৎ পাত্র চান। অলীকপ্রকাশ এ নাটকে সেই পাত্র। কিন্তু চরিত্রধর্মে অলীকপ্রকাশ অসৎ, স্বভাবে বাচাল, শঠ, মিথ্যাবাদী ও অশিক্ষিত। মিথ্যে কথার মোড়কে অলীকপ্রকাশ নিজেকে বাবুয়ানায় প্রকাশ করে। অন্যের বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে চালানো, মিথ্যে শিক্ষার আড়ম্বর, মিথ্যে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অলীকবাবু সত্যসিন্ধুবাবুকে বশ করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে সরল হেমাঙ্গিনী অলীকবাবুকে ভালোবেসে ফেলে। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে অলীকবাবুর যাতে বিবাহ হয় তার জন্য সাহায্য করেছে হেমাঙ্গিনীর দাসী প্রসন্ন ও কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মোসাহেব গদাধর। প্রসন্ন বিধবা। গদাধর প্রসন্নকে বিবাহ করতে চায়। কারণ ধূর্ত গদাধরের বিধবা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, প্রসন্নের টাকা ও বিধবা বিবাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ হস্তগত করা।

কিন্তু হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে অলীকবাবুর বিবাহ পরিণতিই একমাত্র প্রসন্ন ও গদাধরের বিবাহের পথ। ফলে ধূর্ত গদাধর চটুল ও মিথ্যেবাদী অলীকবাবুকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ঘটনার অগ্রগতিতে দেখা যায় অলীকবাবু মিথ্যের জাল ক্রমশ ছিঁড়ে যেতে থাকে। ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় অলীকবাবুর মুখোশ খুলে যায় সত্যসিন্ধুর সামনে। অলীকবাবু তাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ায়, অলীকবাবু নিজকৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়। কিন্তু সরল হেমাঙ্গিনী অলীকবাবুর প্রেমে বিহ্বল হয়ে তাকেই স্বামী হিসাবে পেতে চায়। শেষ পর্যন্ত হেমাঙ্গিনীর রুদ্র মূর্তিতে ভীত হয়ে অলীকবাবু বিবাহের আশা পরিত্যাগ করে বন্দীদশা থেকে রক্ষা পায়।

'অলীকবাবু' নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে হেমাঙ্গিনীর বিধবা দাসী প্রসন্নের

অনুসঙ্গে। জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মোসাহেব গদাধর প্রসন্নকে ভালোবাসার কথা বলে, তাকে বিবাহের কথা বলে। প্রসন্ন, গদাধরের সঙ্গে প্রেমের রসিকতায় নিজেকে আড়াল করে। বিধবা প্রসন্ন পুনর্বার বিবাহ করবার কথা ভাবতেই পারে না। অশিক্ষিত বিধবা রমণীদের 'বিধবা বিবাহ' অকল্পনীয়। গদাধর প্রসন্নকে বিয়ে করতে চাইলে বিধবা প্রসন্ন ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছে,—*"মরণ আর কি! মিনষের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে করতে গেলেম—তুই বে কর্ তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়ারমুখোর বলবার রকম দেখ না—একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ওমা কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কি গা পাগল হয়েছ না কি?"*[১৩২] বিধবা হওয়ার পর প্রসন্ন জানে, অবৈধ প্রণয় করা গেলেও পুনর্বার বিবাহ করা পাপ। পুনর্বিবাহ লজ্জাদায়ক, ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু গদাধর ও হেমাঙ্গিনীর মুখে 'বিধবাবিবাহ' আইনের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়। দ্বিতীয়বার এয়োস্ত্রী হয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে প্রসন্ন।

গদাধর ধূর্ত ও ঠগ। সে প্রসন্নকে ভালোবাসে না। বিধবা প্রসন্নকে বিবাহ করলে গদাধর পাঁচ হাজার টাকা বকশিস পাবে এবং প্রসন্নের গয়না ও অর্থ হস্তগত করতে পারবে। এই উদ্দ্যেশ্যে গদাধর প্রসন্নকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অর্থলাভের আশায় গদাধর তাই মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর ভণ্ড কাজকর্মে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে।

প্রসন্ন বিধবা হবার পর একাদশী ব্রত পালন করে। কিন্তু আমিষের স্বাদ প্রসন্ন ভুলতে পারে না। মাছ, কাঁটাচচ্চড়ির স্বাদ প্রসন্নের মনে পড়ে। অলীকবাবুর বাবুয়ানার মোড়কে বিস্তর মিথ্যে কথার জাল নির্বোধ প্রসন্ন বুঝতে পারে না। তাই অলীকবাবুর মুখে মাছের কথা শুনতেই প্রসন্ন বলে ফেলে,—" *(তাড়াতাড়ি) আমি বাবু একটা মাচ্-চচ্চড়ি আর অম্বল পেলেই সব ভাত গুল খেয়ে ফেল্‌তে পারি।"*[১৩৩]পুনর্বার বিয়ের কথায় প্রসন্নময়ী প্রসন্ন মাছচচ্চড়ির স্বাদ যেন অনেক আগে থেকেই অনুভব করতে পেরেছে। সুপ্ত স্বাদের আস্বাদ পেয়েছে সে। হেমাঙ্গিনীর বিয়ের পরিণতিই প্রসন্নের পুনর্বার বিবাহের সুখ এনে দিতে পারে। তাই প্রসন্ন হেমাঙ্গিনীর বিয়ের জন্য অধিকতর উৎসাহী হয়েছে। বিয়ের আনন্দের আতিশয্যে প্রসন্ন, গদাধরের আসল চেহারার হদিস পায় পায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসন্নর পুনর্বিবাহের আশা চরিতার্থ হয় না। মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর অলীক কথাবার্তা সকলের সামনে প্রকাশ্যে আসে। গদাধর তার মনিব জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধরা পড়ে। অবশেষে প্রসন্ন ও গদাধরের বিবাহ ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

উনিশ শতকে বহু বিধবা রমণী তার বৈধব্য দশা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু

সামাজিক ঘেরাটোপ ও কঠিন নিয়মাচার তাদের মনোবাঞ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোপনে প্রণয়, ঘোগ, লালসা ও ভ্রূণহত্যায় বিধবা নারী জীবনের করুণ পরিণতি ঘটেছে। 'বিধবাবিবাহ' আইন পাশ হওয়ায় বিধবা রমণীদের জীবনে পুনর্বার সুখের আশা জন্মে ঠিকই কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে কিছু লোভী সুযোগ সন্ধানী মসনুষ শুধুমাত্র অর্থের লোভে ও ভোগলালসার লোভে বিধবাবিবাহে রাজী হয়। সেইসব স্বার্থপর মানুষের সমাজ সংস্কার কিংবা বিধবা নারীর পুনর্বার সুন্দর জীবন পাবার অধিকার নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। যার ফলে বহু রমণীকে পুনর্বিবাহের পরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। আলোচ্য নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ *ঠাকুর 'অলীকবাবুর'*র মত কৌতুকপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং পাশাপাশি 'প্রসন্ন' চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ক সমাজ সংস্কারকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একাধিকবার *'অলীকবাবু'* অভিনীত হয়েছিল। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ির 'ড্রামাটিক ক্লাবে'র উদ্যোগে। স্মৃতির সরণী বেয়ে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী *'অলীকবাবু'* নাটকের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন, —*'' কালানুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের এমন কর্ম আর করব না (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বদলে হয় অলীকবাবু। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাদুবশত এর যে অভিনয়টি আমাদের সব চেয়ে সেরা মনে হয় তার পাত্রপাত্রী এরকম ছিল—*

সত্যসিন্ধু	*জ্যাঠামশায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ*
অলীকবাবু	*রবিকাকা*
গদাধর	*সেজোপিসেমশায়*
জগদীশ	*জগদীশদাদা*
হেমাঙ্গিনী	*শরৎকুমারী চৌধুরাণী*
পিসনি	*বর্ণপিসিমা*

কী স্বাভাবিক অভিনয় করতেন বর্ণপিসিমা! এখনো মনে পড়ে, প্রথ দৃশ্যে তিনি দাসীদের মতো মাটিতে বসে হাঁটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গদাধর দরজা ঠেলতেই মাথা তলে বলে উঠলেন, 'দরজা ঠেলে কে ও? ওমা, গদাধরবাবু যে! বড়োমানুষের মোসাহেব, দশটা বাজতে-না-বাজতেই ঘুম ভাঙল? তার পরের দৃশ্যে অলীকবাবু ও সত্যসিন্ধু স্টেজে ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে অলীকবাবু বলছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, কামাখ্যাদেশের

রাজকন্যা, আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি।' সেই ভাব ও কথা এখনো কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেজে অরুদাদার গান । তারই বা কী কায়দা? আর জ্যোতিকাকার সেই চীনেম্যান সেজে চীনেভাষায় কিচিরমিচির কথা—কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! হেমাঙ্গিনী যে হাতে বঁটি ধরে 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' এইরকম কী একটা খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মতো জিনিস।"[১৩৪] অলীকবাবুতে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিনয় করেন তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। *'অলীকবাবু'* নাটকে 'অলীকবাবু চরিত্রে' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বসমক্ষে মঞ্চে অবতরণ। *'জীবনস্মৃতিতে'* এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"*নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;... তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়া ছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।*"[১৩৫] ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত *'অলীকবাবু'* নাটকের নির্দেশনার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথের লেখনীর সাক্ষ্যে জানতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ যেমন মূল নাটককে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তেমনি নতুন চরিত্র, নতুন গান সংযোজন করেছিলেন এমনকি মলিয়েরের বিদেশী প্রভাবমুক্ত করে দেশীয় সৌরভে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বিরজামোহন চৌধুরীর *'বঙ্গবিধবা'* (১৮৮২) নাটক। *'বঙ্গবিধবা'* রূপক নাটক। এ নাটকের বিজ্ঞাপন অংশে নাট্যকার লিখেছেন,—"*এমত অবস্থায় ও অসংলগ্ন অবস্থা, ইহার যা উদ্দেশ্য বোধহয় তাহা সাধন করিতে পারিবে, এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে একবার পাঠ করিলে আমার মানস সফল হইবে।*"[১৩৬] বিদ্যাসাগর মনে করেছিলেন পুরুষের উত্তপ্ত কামনা বাসনার হাত থেকে অসহায় বিধবা নারীদের উদ্ধারের একমাত্র পথ বিধবার পুনর্বিবাহ। নাট্যকার বিরজামোজন চৌধুরী রূপকের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অধর্ম, শঠতা, স্বার্থপরতা, রতিকাম, বিধাতা ও বিধবা এই কল্পিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিধবার সংকট যন্ত্রণাকে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে অধর্মের সংলাপ এর মধ্য দিয়ে,—

"অধর্ম। কি ছাড় নাশিতে

বিধবা সতীত্ব দহিতে তাদের প্রাণে
বিষম বৈদগ্ধ্য অগ্নি করি প্রজ্বলিত
যুঝুক আমার সনে, যে থাকে সে আসি।
.....

রতি ।। শুন রতিকাম তোমাদের শরাঘাতে ঐ কামিনীর হৃদয় জরজর করবে, তা হলে সে সহজেই আমার বশে আসবে। তোমার ঐ শরের প্রভাবে ত্রিলোক উন্মত্ত হয়, একটা সামান্য বঙ্গকুমারীকে পরাজিত কর্তে পারবে না?

কাম।। শুনেছি বঙ্গকামিনীরা বড় সতী। পতির বিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করে না। আজ তাদের সতীত্বরত্ন হরণ করব।...

প্রাচীন যে শাস্ত্র তাহা করি লণ্ডভণ্ড
সৃজিবে তাহার স্থানে নব নব বিধি
নবমত যাতে বঙ্গ যায় রসাতলে
আর দেখ প্রবেশিবে বঙ্গনারী হৃদে,
প্রতি তন্ত্রে থাকিবে তোমরা। সুকৌশলে যাবে
বিচিত্র মোহিনী জাল বিস্তারিয়া
বধিবে জীবনে।''[১৩৬]

এইভাবে অধর্ম, রতিকাম প্রমুখের প্রচেষ্টায় বঙ্গ বিধবার মানসিক দ্বন্দ্ব সংকট সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। বঙ্গবিধবা ঈশ্বরের কাছে আক্ষেপের সুরে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। সে কৈফিয়তের সুরে ধরা পড়েছে বিধবা নারীর মনোকষ্টের নিদারুণ ছবি,—

''বিধবা ।। আবার আমার যে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত হচ্ছে। জ্ঞান। তুমি বঙ্গের বিধবা যেন চিরদিনই উন্মাদিনী থাক।

বিধাতা।। কেন তুমি ভারতে নারীজাতির সৃষ্টি করেছ? যদি সৃষ্টিই করলে তবে কেন পুরুষের ন্যায় কঠিন হৃদয় করলে না। তোমার দোষ নাই, আমাদের কর্ম দোষ। যত মহাপাপীদিগকে ভারতে নারীজাতি করেছ, আমাদের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্চ নরকাগ্নিতে দগ্ধ কচ্ছ। স্বার্থপরতা। এ বঙ্গে এ ভারতে তুমিই আজ রাজা। সকলই তোমার দাস হয়ে রয়েছে। ধন্য তোমায়। ধন্য তোমার ক্ষমতার, তোমার মহিমায় কেহ পরের দুঃখ দেখতে পায় না, অনুভব কর্তে পারে না, বুঝতেও পারে না।''[১৩৭]

নাটকটির পরিসমাপ্তিতে দেবকন্যাদের উক্তিতে বঙ্গবিধবাদের দুঃখের প্রতি নাট্যকার সমবেদনা জানিয়েছেন,—

"উঠ রে দুখিনী বিধবাকামিনী
প্রভাত যামিনী।
অবসান দুখ, হল তব ধনী
চিরদিন তরে দেখ, উদে দিনমণি।
ঐ দেখ কত, বঙ্গ কুলনারী
বসনভূষণ অঙ্গে পরিহরি
নাবিক বিহনে, যেন কাষ্ঠতরী
ভীষণ সংসার সুগভীর বারি
দেখিয়ে ভয়েতে, কাঁপে থরথরি
ভাসিছে টলিছে, ডুবিছে সুন্দরী
দুলিছে গলায় সতীত্বের হার।
বঙ্গের বিধবা অবলা কামিনী
হেরিলে তাদের মুখ সরোজিনী
মুহূর্তের তরে গলিবে তখনি
অসুর হৃদয় পাষাণ তিনি।"[১৩৮]

'বঙ্গবিধবা' নাটকের বিষয় বক্তব্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের যুক্তি শৃঙ্খলা ও বিধবাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। *'বঙ্গবিধবা'* নাটকের কাহিনী পাঠে জানা যায়, মূলত নাট্যকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, বিধবা বিবাহ অপেক্ষা চিত্তসংযমই শ্রেয়।

১৮৮৭ সালের ১৯শে নভেম্বর 'এমারেল্ড থিয়েটারে' অজ্ঞাতনামা রচিত *'বিধবা সঙ্কট'* নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের দিন *'স্টেট্‌স্‌ম্যান্'* পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,—

"THE EMERALD THEATRE
BEADON STREET
GRAND DRAMATIC NIGHTS
Saturday, the 19th November, at 8.30 p.m
OPERA! OPERA! OPERA!
ANAKANONA OR MONDANBHUSMA
And the Second performance of that successful
New and instructive Society play
BIDHOBASANKOT
A LIVELY PICTURE OF THE PRESENT DAY.

Instruction and Laughter will go hand in hand.

.....

G.C. GHOSH, Director and Manager."[১৩৯]

১৮৮৭ সালের ১৯শে নভেম্বর 'এমারেল্ড থিয়েটারে' *'বিধবা সঙ্কট'* নাটকটি অভিনয়ের পর ১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে এ নাটক প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের নাম জানা যায় না। নাটকের পরিচয় হিসাবে নামপত্রে লেখা হয়েছে, 'সমাজনাট্য'। কলিকাতা ১৫১ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট রিপণ প্রেস এজেন্সী থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নাট্যকার 'বিধবাসঙ্কট' নাটকটিকে উৎসর্গ করেছেন, ধনীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু গোপালাল শীলের উদ্দেশ্যে।

নাটকের কাহিনী শুরু ভগীরথ ও তর্কালঙ্কারের কথোপকথন দিয়ে। এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সুশীলা নামক এক বিধবার কাহিনী দিয়ে। সুশীলা ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়। সুশীলার স্বামী বিয়োগ ঘটলেও সে পতিব্রতা। সে তার স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর সুখস্মৃতি অবলম্বন করে বাঁচতে চায় বাকীটা জীবন। সুশীলার দেওর রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের বৌ সৌদামিনী। রামচন্দ্র বৌদি সুশীলাকে পুনর্বার বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু সুশীলা অনড়। সুশীলা জানিয়েছে,—*" ষোল বছর বয়সের সময় তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছেন, সে আজ ৪।৫ বছর হল, তবু যেন আমি তাঁকে চোকের উপর দেখচি।"*[১৪০] রামচন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীও নিজ বিধবা ভাজের পুনর্বিবাহে অসম্মত।

কাহিনী সূত্রে দেখা যায়, বিধু নামক এক বেশ্যা রমণীর প্রতি রামচন্দ্র আকৃষ্ট। রামচন্দ্র মাইনে করে রেখেছে বিধুকে। বিধুর মন রাখতে, বেনারসি, সোনার চন্দ্রহার, গো লাপপাশ, দুমাসের মাইনে ২০০ টাকাইত্যাদি রামচন্দ্র আনে। বিধু খুশী হয়। রামচন্দ্র ও বিধুর অভিনয়ে মোহিত হয়। রামচন্দ্রের পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। মুখোশধারী রামচন্দ্র সেই সব অর্থের অপব্যায় করে। রামচন্দ্রের মত লোকেরা সমাজের সামনে একরূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনকে ভোলায়, আবার লুকিয়ে নানান কুকর্ম করে। বাইরে থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে রামচন্দ্রের মত লোকেরা ভালোমানুষীর নাটক করে,—*"আমরা তো ইংরাজের অনুকরণই কচ্চি। তাদের সকলেরই দুটো করে জীবন আছে। একটা Public Life একটা Private Life. বাহিরের জীবনে কোন দোষ না থাকলেই হল।...তবে হিন্দুগুলো আজও তত সভ্য হয়নি। এ ব্যাটারা চার দিক দেখে...।"*[১৪১]

রামচন্দ্রের মত আরো অনেকে বেশ্যালয়ে নিজেদের জৈবিক পিপাসা চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু বাহ্যিক সমাজে নিজেদের ধর্মপ্রচারক রূপে পরিচয় করাতেও এদের কুণ্ঠা হয় না। মি. মুখার্জিও রামচন্দ্রের মত একই পন্থার লোক। বিধুর মতো রাঁড়ের বাড়ী এসে মদ খায়, মাংস

খায়, বাইরে নিজেদের মুখে পবিত্রতার মুখোশ পরে থাকে।

রামচন্দ্র, সৌদামিনী ও সুশীলার সঙ্গে হরিপ্রসন্নের সাক্ষাৎ হয়। সৌদামিনী স্বাধীন ভাবে কথা বলতে জানে। রামচন্দ্র সে স্বাধীনতা দিয়েছে তার স্ত্রী সৌদামিনীকে। সুশীলাকে নিয়ে সৌদামিনীর অনর্থক চিন্তা তার গোপন অন্তরের ভালোবাসার স্বার্থে। সম্পর্কে বড় জা সুশীলার সঙ্গে সৌদামিনীর বোনের ন্যায় সম্পর্ক। কিন্তু বিধবা ভাজ সুশীলার পুনর্বিবাহকে সমর্থন করে না সুশীলা। সুশীলার সামনে হরিপ্রসন্নের উপস্থিতিও সৌদামিনী তাই মেনে নিতে পারে না। সুশীলারপক্ষ নিয়ে সৌদামিনীর উক্তি প্রত্যুক্তির বিনিময়ে হরিপ্রসন্ন জানায়,—"*আপনারা স্ত্রীলোক, হাজার বিদ্যবতী হাজার বুদ্ধিমতী হউন, তবু সদসদ বিচারে আজও আপনারা পুরুষের সমকক্ষ নন।*"[১৪২] হরিপ্রসন্নের বাক্যে সৌদামিনীর দ্বিগুণ ক্ষোভ জন্মে। সৌদামিনীর বক্তব্য হল, যে সব বিধবা নারীরা পুনর্বার বিবাহ করতে রাজী নয়, তাদের জোর করে বিবাহ দেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু হরিপ্রসন্ন বোঝাতে চেয়েছে বিধবা বিবাহের গুরুত্বকে, জোর করে বিবাহ দেওয়াকে নয়, —"*আমাদের বিশ্বাস বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় দেশ উৎসন্ন যাচ্ছে। এ বিশ্বাসে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত যাহাতে হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা কি অন্যায়?*"[১৪৩] সৌদামিনীর বাক্যবাণ ক্রমশ কঠিন হওয়ায় হরিপ্রসন্ন বিচলিত বোধ করে। সুশীলার ধারণা পুনর্বার বিবাহ করলে কুপথে যাওয়া হবে। তাই সে বিধবার পুনর্বিবাহের ঘোরতর বিরোধী।

ঘটনাসূত্রে দেখা যায় গুরুদেব কালীকিঙ্করের দুই মেয়ে বিধবা। মৃত ছেলের বৌকে নিয়ে কালীকিঙ্করের চিন্তার শেষ নেই। বিধবা বৌমা চারুমতী শিক্ষিতা। কালীকিঙ্করের বিধবা বৌমা চারুমতী শিক্ষিতা। সে বাঙলা বই সব পড়েছে। দীনবন্ধুর নাটক এবং বঙ্কিমের নভেল কণ্ঠস্থ করেছে। ধর্মপুস্তকেও চারুমতীর আগ্রহের শেষ নেই। চারুমতীকে পড়াতে দুজন খ্রীষ্টান শিক্ষয়ত্রী আসেন। বিধবা চারুমতীর স্বামী প্রাপ্ত উপাধির কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে তার পরিচয়ে শুধুমাত্র চারুমতী নামটি ব্যবহার করে। চারুমতী সুশীলার বৌদি। সুশীলা চারুমতীকে তার চিঠি দেখাতে বলে। কিন্তু চারুমতী অস্বীকার করে। একের চিঠি অন্যের দেখা উচিৎ নয়, এমনকি স্বামীর চিঠি স্ত্রীর বা স্ত্রীর চিঠি স্বামীর দেখা ঠিক নয়। এর উত্তরে সুশীলা স্বামী স্ত্রীর গোপন কোনো বিষয় থাকতে পারে না বলে জানায়। যদি থাকে তবে সে স্ত্রী অসতী। শিক্ষিত চারুমতী জানিয়েছে, যে মেয়েটি দশ বছর বয়সে বিধবা হল, সে মেয়েটির ভবিষ্যতে আর কোনো কিছু পাবার আশা নেই। তাকে সংসার সকল সুখে বঞ্চিত করবে। আর পুরুষেরা সাতবার বিবাহ করবে। স্ত্রী মারা গেলেও তার শোক ফুরোতে না ফুরোতেই আরেকটি বিবাহ করবে।

চারুমতীর কথায় সুশীলার মন বিচলিত হয়। সুশীলা বলে যে, হিন্দু কুলের বউদের স্বামীর অনুগামী হতে হয়। খ্রীষ্টানরা এসব বোঝে না। তাই চারুমতী যেন কোনো মতেই খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীদের পরামর্শ মত না চলে।

সুশীলার বোন ও চারুমতীর ননদ সরলাও চোদ্দ বছরের বিধবা। সরলা বৈধব্যকে মেনে নিয়ে ধর্মেকর্মে মনোনিবেশ করেছে। সরলার ধারণা এ জন্মে ভালো ধর্মাচারণ করলে পরজন্মে ভালো ফল হবে। পূর্বজন্মে পাপ করেছিল বলেই হয়ত সরলা এজন্মে বিধবা হল। সরলা নিরাভরণ। তার প্রতিটি গহনা গুরুদেবের পায়ে অর্পিত। পুরুষ মানুষ গুরুদেব, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে সরলা গুরুদেবের প্রতিটি বাক্যকে ভগবানের বাক্য বলে মনে করে। গুরুদেব সরলাকে বিধবার আচার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান দেয়,—''*বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান ধর্ম্ম, সকল প্রকার বিলাসিতা ও ভোগেচ্ছা ত্যাগ করাই বিধবার ব্রত।*''[১৪৪]

নাট্যকার খুব সচেতনভাবেই গুরুদেবের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিধবাদের পালনীয় কর্তব্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। গুরুদেব বলেছেন যে, জীবশুদ্ধ নিজের কর্মফল ভোগ করে। যে ভালো কর্ম করে সে ভাল ফল পায়। সৎ কার্যের ফল সুখ ও শান্তি। অসৎ কর্মের ফল দুঃখ ও ক্লেশ। সংসারে অ-পুত্রবতী বিধবা দ্বারাই ধর্মকার্য ভাল সাধন হয়। আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, প্রতিপদ ধ্যান, দেব আরাধানা, তীর্থ দর্শন ও গুরুজনের সেবাশুশ্রুষা এগুলি বিধবাদের প্রধান কার্য। আর এর নামই ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু চারুমতী এইসব কথায় কান দেয় না। কারণ আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবোধ তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছে। সে বুঝতে পারে কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল। কিন্তু সরলা এবং সুশীলার ধারণা খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীরাই চারুমতীর মাথা নষ্ট করেছে। তাই চারুশীলার পড়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সুশীলা বদ্ধপরিকর।

কালীকিঙ্করের বাটীতে দেখা যায়, আহ্লাদির সাহায্যে দুশ্চরিত্র রামচন্দ্র চারুমতীকে নিয়ে পালাতে চায়। ছদ্মবেশে রামচন্দ্র ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ করে সুশীলাকে চুরি করার জন্য ছক কষে। কিন্তু আহ্লাদির বিশ্বাসঘাতকতায় কালীকিঙ্করের হাতে রামচন্দ্র ধরা পড়ে। কালীকিঙ্কর রামচন্দ্রকে পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করার কথা ভাবেন। রামচন্দ্র ঘুষ দিয়ে কোনক্রমে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে রামচন্দ্র ও হরি প্রসন্নকে নাকখৎ দিতে হয়।

নাটকের অন্তিমে দেখা যায়, কালীকিঙ্কর তাঁর মেয়ে সুশীলা ও সরলাকে নিয়ে হরিদ্বার যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। বিধবা বৌমা চারুমতীকে বাপের বাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। বৌমা চারুমতীকে নিয়ে কালীকিঙ্করের আক্ষেপের শেষ নেই। চারুমতী বিপথগামী হয়েছে তা

জানতে পেরে কালীকিঙ্কর বিধবা নারীর দুঃখজনক জীবনের করুণ দিকটি অনুভব করেছেন। আক্ষেপ করে জানিয়েছেন,—''*ঠাকুর! বলতে পারেন, কোন পাপের ফলে কন্যা বিধবা হয়? বিবাহিত পুত্র, পত্নী রাখিয়া অসময়ে মারা যায়? আর কোন পুণ্য ফলেই বা পুনর্জন্মে আর এ বিধবা সঙ্কট না ঘটে?*''[১৪৫] কালীকিঙ্কর তার বৌমা চারুমতীর মুখ দর্শন করতে চায় না। চারুমতী অনুতপ্ত হয়। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে তার দুই ননদ সরলা ও সুশীলার সঙ্গে হরিদ্বার যেতে চায়। কালীকিঙ্কর রাজী হয়। অবশেষে সরলা, সুশীলা, চারুমতী,কালীকিঙ্কর ও গিন্নীসহ প্রত্যেকে হরিদ্বারে চলে যায়। এখানেই নাটকটির কাহিনী শেষ হয়।

নাট্যকার খুব সহজেই সমাজের বাস্তব দিকটি আলোচ্য নাটকটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। সমাজে বিধবা বিবাহ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বহু আন্দোলন চললেও খোদ বিধবাদেরই পুনর্বিবাহে মত ছিল না। কোনো কোনো বিধবা নারী শিক্ষিত হবার তাগিদে নিজেদের মানসিকতার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। সমাজের ভালো-মন্দের দিকটি বুঝতে শিখেছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষ দ্বারা রচিত কিছু নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শিখেছিলেন এইসব নারীরা। কিন্তু কিছু বিধবা নারী হিন্দু সংস্কারবশতঃ তাদের বৈধব্য জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুত্ব ধর্মরক্ষায় নিজেদের জীবনদান করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিরোধী কাজে তারা নিজেদের অসতী বলে মনে করেছিলেন। বিধবা হয়ে পুণরায় বিবাহ করাকে পাপ কাজ বলে মনে করেছিলেন এবং পুনুর্বিবাহ থেকে বিরত থেকেছিলেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রণীত *'তরুবালা'* নাটক। *'তরুবালা'* নাটকের উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার লিখেছেন,—''*মহিষাদল রাজকুলভূষণ মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের শ্রীচরণকমলে গ্রন্থাকার কর্ত্তৃক এই নাটক ভক্তি সহকারে উৎসর্গীকৃত হইল।*''[১৪৬] *'তরুবালা'* নাটকটিতে নাট্যকার 'তরুবালা' নামক এক সতী স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা নারীর কাহিনী তুলে ধরেছেন। আলোচ্য নাটকে তরুবালার একনিষ্ঠ প্রেম ও স্বামীপরায়ণা মনোভাবের মধ্য দিয়ে নিজ স্বামী সোহাগের অধিকারিণী হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত করেছেন নাট্যকার। 'বিধবা বিবাহে'র আন্দোলনে সামাজিক ভীতি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সমাজ ভয়কে উপেক্ষা করে অনেক পুরুষ 'বিধবা বিবাহে' এগিয়ে এলেও বিধবা নারীরা সেভাবে সাড়া দিতে পারেননি। নাট্যকার সেই বাস্তব সত্যকে *'তরুবালা'* নাটকে উপস্থাপিত করেছেন 'শান্ত-বেণী'র উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে।

তরুবালার ননদ 'শান্ত' একজন বিধবা নারী। বিধবা শান্ত তার শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিসহ

বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। শান্তকে তরুবালা নিজ বোনের মত ভালোবাসে। নাটকটিতে তরুবালার পাশাপাশি শান্তর বৈধব্য জীবন ও তার অবিচল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকার অমৃতলাল বসু শান্তর বৈধব্য জীবনকে ভক্তিমার্গে দৃঢ় করেছেন। 'বিধবা বিবাহে' শান্তকে অগ্রসর হতে দেননি। নাটকটিতে একাধারে যেমন, স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা একজন নারীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে একটি বিধবা নারীর সমগ্র জীবনের পরিণতির কথা ধরা পড়েছে।

'তরুবালা' নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে । প্রতিটি অঙ্ক গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত হয়েছে। *'তরুবালা'* নাটকের প্রথম অঙ্কে 'অখিলের বাটীর দরদালানে অখিল ও প্রসন্নের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনা শুরু হয়। অখিলের মাতা প্রসন্ন বিধবা। অখিলের স্ত্রী তরুবালাকে প্রসন্ন সম্বন্ধ করে ঘরের বৌ করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অখিল তাঁর স্ত্রী তরুবালাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চায় না। কারণ অখিল প্রণয় লোলুপ। নভেলের নায়িকার মত প্রণয় মাধুর্য অখিল তরুবালার মধ্যে খুঁজে পায়না। তাই তরুবালাকে অখিল স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায় না।

বেণী হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। বেণী কুটিল মনোবৃত্তির একজন মানুষ। বেণী অখিলের সম্পত্তি হস্তগত করতে চায়। বিধবা শান্তকে হাতিয়ার করে সে অখিলের সম্পদ দখল করতে চায়। শান্ত তার স্বামীকে তেমনভাবে জানার আগেই বিধবা হয়। তরুবালার কথায়,—''*এই যে শান্ত ঠাকুরঝি সোয়ামী কেমন জানতে না জানতে বিধবা হলো, তা কি করবে, চুপ করে সয়ে যাচ্ছে, ভগবান সইতে দিয়েছেন সইছে।*''[১৪৭] শান্তর মত প্রায় প্রত্যেকটি নারীই বৈধব্যকে নিয়তি বলে মনে করে। ভগবান সহ্য করার জন্য নারীদের বিধবা করেন। বিধবাদের অনাড়ম্বর জীবনে। ঠাকুর দেবতার আশ্রয়ই একমাত্র সম্বল। তাই বিধবাদের ভগবান মুখ বুঝে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন —এমনটাই তৎকালীন সমাজের ধারণা।

তরুবালার মনোকষ্ট ও দাদা অখিলের বহির্মুখি মনোভাবে আমোদিনী ও বোন শান্তর উদ্বিগ্নতা দেখা যায়। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শান্তর স্বামীহারা বেদনার প্রকাশ পেয়েছে। বিধবা শান্ত তাঁর বৌদি তরুবালার সুখ দেখে যেতে চায়। শান্ত কোনদিনই স্বামীসুখ পায়নি,—''*আমার বোন ইহকালের সকল সাধই ফুরিয়েছে! দেবতা বামুনের পূজা করি বুড়ো একটু সেবা আর তোমরা দুজনে সুখে থাক তোমাদের ছেলে-পিলে হোক নিয়ে মানুষ করি, এই বই আমার আর কি সুখ আছে বল!*''[১৪৮] বিধবা শান্ত অন্যের সুখের মধ্য দিয়ে শান্তি পেতে চায়। নিজের জীবনের অসহায় পরিণতি দাদার সন্তানকে স্নেহ করে ভুলতে চায়। সুখী হতে চায় দেবতার চরণে নিজেকে

সঁপে দিয়ে। মাতার সেবার মধ্য দিয়ে, জীবনের অনাকাঙ্খিত পরিণামে থেকেও সুখের ছায়া দেখতে চায়।

কথা প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় শান্তর পুনর্বিবাহের কথা বলেন তাঁর মা প্রসন্নের কাছে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু মৃত্যুঞ্জয়ের সংলাপে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেছেন,—"*শান্তকে দেখলে আমার এক একবার মনে হয় যে বিদ্যাসাগরের কথা ঠিক, বিধবা হওয়াই উচিত; আহা দুধের বাছা!*" [১৪৯] কিন্তু শান্তর এতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে মনে মনে দেবতাজ্ঞানে স্বামীকেই পূজা করেছে। তাই স্বামী বিয়োগের পর নিজ প্রাণ দেবতার চরণে সমর্পণ করেছে। নিজ বয়ঃসন্ধিকালে ধর্মে মনঃসংযোগ করেছে। শান্তর কথায়, বিধবা বিবাহ হলেও পরকালে স্বামীর আশ্রয় কোন্‌টি হবে তা নিয়ে সে সন্দিহান। তাই বিধবাদের বিবাহ না করাই শান্তর মতো মেয়েদের পক্ষে উচিত কাজ। শুধু শান্ত নয়, উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তর মত বহু নারীই মনে করে বিধবা বিবাহ হলে পরকালে শান্তিপ্রাপ্তি হয় না। বিধবাদের পুনর্বিবাহ মহাপাপ। বিবাহ একবারই হয়। যদি সেই স্বামী বেঁচে থাকে সেই নারী ভাগ্যবতী। যদি স্বামী প্রয়াণ ঘটে তবে তা অদৃষ্ট। যার ফলে যৌবন সহ বাকী জীবনের ঠাঁই হয় ঠাকুর দেবতার কর্মে, চরণে ও সেবায়।

শান্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ে। বেণী এর কারণ জানতে চাইলে শান্ত খুব সহজেই উত্তর দেয় যে কালী তার ভাসুরের নাম। অর্থাৎ বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়ী চলে আসার পরও শান্ত শুধুমাত্র স্বামী নয় শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত নিয়ম মেনে চলে। শান্ত শুধুমাত্র মৃত স্বামীর স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করতে চায় ।বিধবা হওয়ার আগে শান্ত বঙ্কিমের নভেল 'বিষবৃক্ষ' পড়ত। কিন্তু বিধবা হওয়ার পর উপন্যাস পড়ে না, মহাভারত পড়ে। তার কারণ সে জানায় যে, মহাভারতে উপদেশের কথা আছে। যা পড়লে মন শান্ত হয়। *'বিষবৃক্ষ'* উপন্যাসের প্রতি শান্তর ক্ষোভ যেন তার জীবনের ভীতি,—"*সেইতো যা'তে বিধবা কুন্দর আবার বে হলো? আহা ভারি উপদেশ! আপনিও মলো সূর্য্যমুখীর সংসারটাও ছারেখারে দিলে।*"[১৫০] শান্ত তাই বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতে পারে না। সে মনে করে বিধবাদের পুণরায় বিয়ে হলে তারা শুধু অমঙ্গল করতে পারে, সংসারের ক্ষতি করতে পারে। শান্তর এ ধারণা বেণীকে আঘাত করে। তাই শান্তর ভুল ধারণা ভাঙতে চায় বেণী,—

"*শান্ত ।। ...হিন্দুর ঘরে বিধবা বে করাই পাপ।*

বেণী ।। শান্ত, এটি তোমার সম্পূর্ণ ভুল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রমাণ করেছেন। তুমি তো রামায়ণ পড়েছ, দেখ মন্দোদরী, তারা,

দুজনেই বিবাহ করেছিল।

শান্ত ।। হাঃ হাঃ হাঃ! বেণীদা, খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ, একজন রাক্ষসী একজন বাঁদরী! আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশেও দেখেছি দুলে কাওরার মেয়েরা ছেলে কোলে করে বে করে ভদ্র লোকের ঘরে কি হয়।"[১৫১] শান্তর ধারণা তার স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গিয়ে দেবতা হয়েছেন। আর শান্ত মারা গেলেই স্বর্গে তাদের দেখা হবে। সেখানে তারা অমর। আর তার বিধবা হওয়ার ভয় থাকবে না। সেই সময়কালে পরকালীন সুখের আশায় পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ ত্যাগ করে শান্তর মত বিধবা রমণীরা মন অবিচলিত রাখতে ছুটে গেছে ঠাকুরঘরে। পাছে তাদের মন বিচলিত হয়, পাপী হয় এই ভয়ে। বেণী শান্তকে পুণরায় বোঝানোর চেষ্টা করলে শান্ত শুনতে চায় না। কিন্তু বেণী শান্তকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে। কারণ বেণীর উদ্দেশ্য শান্তকে বিবাহ করা।

বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় বিধবা বিবাহের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে সন্দিহান। তিনি বিধবাদের পুণরায় বিবাহকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু নাতনীসম বিধবা শান্তকে দেখলে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হয় পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। আবার শাস্ত্রকারের রক্তচক্ষুকে সঠিক ভাবতে চায় বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মনে করেন সংসারে ব্রহ্মচারী একমাত্র বিধবারই আছে। বিধবারাই হিন্দুধর্ম রক্ষা করছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে করেন,—হিন্দুর ঘরে বিধবাই জাগ্রত দেবতা!

বিবাহিত বেণী দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। তাই সে আবার বিধবা শান্তকে বিবাহ করতে আগ্রহী। মূলত এ নাটকে বেণী শান্তর প্রতি ভালোবাসায় দুর্বল। কিন্তু শান্তকে বিবাহ করে সে তার সম্পত্তি হস্তগত করার বাসনাও মনে পোষণ করে। একাধিক বিবাহ করা তৎকালীন পুরুষ জাতির অধিকার। একটি রমণীতে সন্তুষ্টি না হলে পুণরায় বিবাহ পিঁড়িতে বসতে এদের দ্বিধা নেই। তাই বহুবিবাহ প্রথারও ইঙ্গিত আছে *'তরুবালা'* নাটকে। বেণী সহচরীকে দিয়ে শান্তকে, বিবাহে রাজী করানোর কথা বলে। বিধবা শান্তর বৈধব্য আচার পালনের নিষ্ঠা অসীম। স্বামী বিয়োগের পর তেরো বছরের বিধবা শান্ত নিজেকে পুরোটাই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে।

বেণীর বন্ধু হীরালাল অখিলকে কুপথে যাবার জন্য ছলে বলে এক বারাঙ্গনার কাছে নিয়ে যায়। বই পড়া প্রেমের ফাঁদে ধরা দেয় অখিল। বারাঙ্গনা পারুল নিজ কৌশলে অখিলকে পুরোপুরি প্রেমে বশ করে ফেলে। পারুলের প্রণয়ে অখিল স্বর্গীয় সুখ পায়। পারুল গান গেয়ে অখিলকে প্রেমে মাতাল করে রাখে। সেইসঙ্গে পারুলের মাতা বামা অখিলের কাছ থেকে টাকা

আদায়ের ফন্দী আঁটে। ছলেবলে অখিলের থেকে টাকা নেওয়াই পারুল ও বামার উদ্দেশ্য। বামা ও পারুল নতুন করে টাকা উপার্জনের কথা ভাবে। অখিলের থেকে টাকা নেওয়া ছাড়াও অন্য বাবুদের মজলিস করিয়ে গান গেয়ে টাকা রোজগারের কথা ভাবে। অবশেষে অখিলের কাছে পারুলের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়। ফলে অখিল পারুলের কাছ থেকে চিরবিদায় নেয়।

অন্যদিকে সহচরী শান্তকে নিয়ে বেলগাছিয়া বাগানে আসে। কৌশলে সহচরী শান্তকে একা রেখে একটু রেখে একটু দূরে চলে যায়। বেণী সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে এসে শান্তকে জানায় যে, শান্তর একটি সুন্দর সন্তান হবে। শান্ত জানায় যে, সে বিধবা সুতরাং তার সন্তান হবার উপায় নেই, স্বামী সোহাগ পাবার কোন অবকাশ নেই। শান্ত সন্ন্যাসীর কথায় ভীত হয় ও অন্য কোথাও যাবার জন্য উদ্যোগী হয়। বেণী তখনি তার ছদ্মবেশ ছেড়ে শান্তকে বলে যে, সে শান্তকে ভালোবাসে, বিবাহ করতে চায়। কিন্তু শান্ত অনড়। শান্ত বৈধব্যাচারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। স্বর্গীয় স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে সে চোখে দেখতেও রাজী নয়। সহমরণ প্রথা থাকলে শান্ত তার স্বামীর চিতায় হাসতে হাসতে উঠতে পারত। শান্ত কোনভাবেই বিবাহ করতে রাজী নয়। তাই বেণীকে সে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে।

মৃত্যুঞ্জয় তার স্ত্রী আমোদিনীকে নিয়ে সুখী। আমোদিনী অখিলকে তরুবালার কাছে ফিরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটে। আমোদিনী তরুবালাকে অখিলের মনের মতো করে সাজিয়ে রাখে। অখিল আমোদিনীর ঘরে এলে তরুবালা পাগলিনীর বেশে প্রেমের কবিতা বলে। অখিল প্রথমে বুঝতে পারে না এ কবিতা কার? চিনতে পারে না তরুবালাকে। কিন্তু ক্ষণিক পরেই তরুবালার মধ্যে তার প্রেম দেখতে পায়। তরুবালাকে নিজ স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। তরুবালাও আমোদিনীর শেখানো কথা ছেড়ে নিজের কথা বলে। আমোদিনীর সহচর্যে তরুবালা অখিলকে ফিরে পায়। অখিল তার ভুল বুঝতে পারে। আমোদিনী ও মৃত্যুঞ্জয় তাদের সমস্ত সম্পত্তি অখিলকে লিখে দেয়। শেষে আমোদিনীর গানের মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকা পতন ঘটে।

১৮৯০ সালে ২০শে ডিসেম্বর 'স্টার' থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় *'তরুবালা'* নাটকটি। অভিনয়ের দিন *'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ্'* পত্রিকায় প্রকাশিত *'তরুবালা'* নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,— ''New Drama ! Season`s Sensation! New Drama !

STAR THATRE
SATURDAY, THE 20TH DECEMBER, AT 9 P.M
Baboo Amrita Lal Bose`s New Society Comedy

''TARUBALA''

Our Domestic Doings Dramatically Described
Tarubala-The Model of a Hindu Wife
Hindu young widow`s Devotion for her Departed Lord
NEXT DEY, SUNDAY, AT 6.30 P.M.
Malina Bikash & Bellick Bazar
G.C. GHOSH, Manager."[১৫২]

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ঘটে। ওই বছর প্রকাশিত হয়, অমৃতলাল বসুর *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'* নাটক। অমৃতলাল বসুর বিশিষ্ট শোকনাটক *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'।* বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে এ নাটক রচিত। নাটকটিতে বিদ্যাসাগরের সামাজিক কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন নাট্যকার। নাটকটি পাঁচটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। ছাব্বিশ পৃষ্টার এই ছোটো নাটকে অমৃতলাল সাতটি গান ব্যবহার করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে সরস্বতীর কমলবন। সেখানে দেবী সরস্বতী ও বঙ্গভাষার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যদৃশ্য শুরু হয়েছে। শোকে কমল বন মুদিত হয়ে আছে,—

"*সরস্বতী ।।* *কেন গো সংসার আজি মলিন এমন।*
পরেছে প্রকৃতি সতী শোক আবরণ।।
অরুণ কিরণ রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাখা,
বিষাদ মাখিয়ে ব'য় কেনগো পবন।
.....
বঙ্গভাষা ।। *আশায় পড়িল ছাই।*
আহা বিদ্যাসাগর নাই, বিদ্যাসাগর নাই!
জীর্ণবাস দূর করে, নব সাজ দিল মোরে,
সেজন নাহিক আর কা'র পানে চাই।"[১৫৩]

এই অংশে বিপন্ন বঙ্গভাষার আর্তনাদ তাকে সরস্বতীর সান্ত্বনাদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ও দেশের সর্বব্যাপী শোকের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের চিতার অদূরে পাঁচজন নাগরিক উপনীত হয়েছেন। তাঁদের কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। বিদ্যাসাগরের অকালে প্রয়াণে শোকস্তব্ধ নাগরিকেরা জানিয়েছেন,

—'বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাবো', 'বিধবা বিবাহের মতটা প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থকত না'। চতুর্থ নাগরিক জানিয়েছে,—''*বিধবা বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনাক্ষমা বালিকা বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়।*''[১৫৪] জনতা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনাস্থল, কর্ম্মাঠার সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ। এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর বালক পৌত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তার প্রশংসা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে কলকাতায় রেখে আসবেন বলে রওনা দিয়েছিলেন। পথে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি শোকের সাগরে নিমজ্জমান হয়েছেন। এবং পথ হতেই আবার গ্রামে ফিরে গেছেন।

চতুর্থ দৃশ্যের ঘটনাস্থল স্বর্গপথ। ঋষিদের উক্তিতে বিদ্যসাগরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পয়ার ছন্দে ঋষিদের সংলাপে নাট্যকার লিখেছেন,—

"*২য় ঋষি ।। সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে*
কাটাইল নরলীলা বিদ্যা বিতরণে,
দান হেতু উপজিল নহে নিজ তরে
নিজ সুখে দিয়ে ডালি পর দুঃখ তরে।
যে নামে ঈশ্বর পান উচ্চ পরিচয়
সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায়।
বিদ্যার সাগর সেই দয়ার আধার
আসিছেন আমরায় করিতে বিহার।"[১৫৫]

পঞ্চম দৃশ্যে বৈকুণ্ঠপুরীতে বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। অপপ্সরাগণ বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন করেছেন স্বর্গে,—

"ঈশ্বর চরণে হল ঈশ্বর মিলন।।
নাহি অস্থি চর্ম্ম মায়া, জ্যোতির্ম্ময় ছায়া কায়া,
দেব মাঝে দেব সাজে দিল দরশন।
বিদ্যার সাগর বলে; খ্যাত ছিল মহীতলে,
দয়ার সাগর বলে স্বর্গে আবাহন।।''[১৫৬]

'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' (১৮৯১) নাটকটিকে 'বিধবা সংকট' চিত্র উপস্থাপিত না হলেও 'বিধবার অন্তর্বেদনা'র প্রসঙ্গ এসেছে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্তার সঙ্গে। নাট্যকার বলতে চাইলেন, বিধবার সমব্যাথী আর কেউ রইলেন না যিনি বিধবার সপক্ষে কথা বলবেন। বিধবা বেদনা দরদ দিয়ে উপলব্ধি করবেন।

'স্টার' থিয়েটারে ১৮৯১ সালের ২২শে আগষ্ট অমৃতলাল বসুর *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'* (১৮৯১)' নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয়ের দিন 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ্' পত্রিকায় প্রকাশিত*"বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'* নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,— ''The Great National Mourning!

STAR THATRE
TO-NIGHT
SATURDAY, 22ND AUGUST, AT 9 P.M
TH DECEMBER, AT 9 P.M
A New Dramatic Representation
BILAP
The Welcome of Vidyasagar in Heaven
TO BE PRECEDED BY
SITA`S EXILE
Next Day, Sunday, at Candle-light
NARAMEDH YAJNA
AND
BILAP

AMRITA LAL BOSE, Manager."[১৫৭]

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল বসুর *'বাবু'* নাটক। 'কমেডি অফ ম্যানার্স' জাতীয় এই নাটকে উনিশ শতকের শেষলগ্নে মধ্যবিত্ত বঙ্গসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বাবুদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বাবু, দেশহিতৈষী বাবু, সংস্কারক বাবু, ছোকরাবাবু, ধর্ম্মধ্বজ বাবু—এই নাটকের রঙ্গরসিকতার পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। আক্রান্ত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দু সমাজের বহু সনাতনী সংস্কারও হয়ে উঠেছে এ নাটকের বিষয়। দেশহিতৈষীদের ঔদ্ধত্য ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা কৌতুকে পরিণত হয়েছে। বাবু নাটকে নাট্যকার ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। কন্দর্পকান্ত পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম সংস্কারক। সে বিধবা বিবাহের প্রচারক। তার বাড়ির সামনে বিধবা রমণীদের গান গাইতে দেখা যায়,—

''পতি ম'লে হাতের বালা খুলব না লো খুলব না।

বিচ্ছেদ আগুন প্রাণে আর ত

জ্বালব না লো জ্বালব না।

আমরা সবাই বিদ্যেবতী

আস্‌লে পরে দোসরা পতি।

টানলে প্রাণ তার পানে সই

কেন ঢলব না লো ঢলব না।''[১৫৮]

'বাবু' নাটকে ছোকরাবাবু কন্দর্পকান্ত ও তার মাতামহী আজিমার মধ্য দিয়ে বিধবা প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। কন্দর্পকান্ত পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে। ছয়মাস যাবৎ কলকাতায় বাস করে নিজেকে সে অতিবড় সভ্যসমাজের একজন মনে করে। পূর্ববঙ্গীয় বাঙাল ভাষা ও শহুরে ভাষায় মিশ্রণে সৃষ্ট অদ্ভুত ভাষায় সে কথা বলে। কন্দর্পকান্ত ভাবে সে বাঙাল ভাষায় আর কথা বলে না, সভ্য সমাজের অধিকারী হয়ে সে সমাজের মঙ্গল করবে। 'বিধবা বিবাহ' দিতে পারলে কন্দর্পকান্ত সমাজে মানী ব্যক্তি হবে। তাই কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধ মাতামহী বিধবা আজিমাকে পুনর্বিবাহ করাবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। আজিমা হতবাক হয়ে যায় বৃদ্ধ বয়সে বিধবা বিবাহের কথা শুনে,—*''এ কেমন কথা কোস্ রে কন্দর্পে? তিনকুরি মোয়া তিন গোন্ডা বয়স অইল আমার; আরাই কুরি বছরের কালে তোর আজা কুঞ্জেও বস্‌ছে, এখন আমার তুলসী তলায় সোমাজ দিলেই অয়,—গউরচন্দ কবে দয়া কর্‌বোন-টানি লবোন, আমি বিয়ে কর্‌বো, এ কেমন কথা কোয়? হিন্দুর গরে রাঁড়ের বিয়ে কি অয়? দর্ম্ম যাবা, দর্ম্ম যাবা।''*[১৫৯] কিন্তু ছোকরা কন্দর্পকান্ত নাছোড়। কন্দর্পকান্ত সংস্কারক বাবু সজনীকান্তর লেকচার শুনে মনে মনে ঠিক করে যে, সে তার মাতামহীকে বিবাহ দিয়ে দেশ উদ্ধার করবে এবং সমাজে নিজের মান রক্ষা করবে।

সমাজে বিধবাবিবাহ আবশ্যক। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে সমাজের কলুষতা দূরীভূত হবে। কিন্তু নির্বোধ কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধ মাতামহীর বয়সজ্ঞান না করে পঁচিশ বছর বয়েসী এক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চায়। কন্দর্পকান্তি বৃদ্ধ আজিমাকে বলেছেন,—*"আজিমা, আরে রোজ রোজ তোমার কতই বিরহ অইচে, বিয়া না অলি তুমি আর বাজবা না।''* [১৬০] কন্দর্পকান্ত বৃদ্ধ আজিমাকে বিয়ে দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল খাওয়াতে চায় , তার বিরহ মোচন করে চায়।

নির্বোধ ছোকরা কন্দর্পকান্ত নিজেকে ভারত সন্তান হিসাবে প্রমাণ করতে চায় তার মাতামহীর বিবাহ দিয়ে। বিধবা বিবাহ দিলেই সভ্য হওয়া যায়, ভদ্র সমাজে স্থান পাওয়া যায়—এই

ধরণের মানসিকতায় বিশ্বাসী ছোকরা কন্দর্পকান্ত বিধবা মাতামহীকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। নাট্যকার রীতিমত হাস্যকর ভাঁড় জাতীয় চরিত্র হিসাবে কন্দর্পকান্তকে *'বাবু'* নাটকে তুলে ধরেছেন।

বৃদ্ধা আজিমার পুনর্বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কিছু সভ্য মহিলাদের গান *'বাবু'* নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। তারা প্রত্যেকে আজিমাকে বিবাহ দিয়ে উদ্ধার করতে চায়। সত্তর বছর বয়েসী বিধবা আজিমাকে পুণরায় বিবাহ দিতে চেয়ে 'বিধবা বিবাহ' নামক সংস্কারমূলক কর্মটি উপহাসিত হয়েছে *'বাবু'* নাটকে। কৃষ্ণ নামে মুখরিত বৃদ্ধা আজিমা বিধবা বিবাহে রীতিমত বিরক্তবোধ করে। কিন্তু নির্বোধ তথাকথিত মহিলাদের পক্ষে সেটুকুও বোঝা সম্ভব হয়নি। সভ্য মহিলাদের মধ্যে ২য় মহিলা বলে ওঠেন,—*'' অয়ি বিরহতাপ তাপতাপিনী আসন্নপ্রায়া বিষন্নবেদনা বিরহিনী বিধবা বালে! অয়ি কন্দর্পকান্তস্য মাতামহী মহীয়সী মহিলে! মা ভৈঃ মা ভৈঃ, আমরা এসেছি, —নবপতিরূপে আমোঘ বিবেক দিয়ে তোমার বহুদিনাবদ্ধ বিরহ কষ্ট শ্রীঘ্রই মোচন কর্‌বো।''*[১৬১] তারা একসঙ্গে গান করে,—

''ঠানদি তোমায় সাজাব লো ক'নে।
অতি যতনে, যত এয়োগণে।।
বেণী বাঁধিব ওলে রূপুলি চুলে,
থরে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে,
ধরে কি না ধরে দেখ নূতন বরের মনে,—
পরাব আবার কি গুলবাহার,
মাছে ভাতে দিনে রেতে হবে লো আহার,
বিচ্ছেদ বাধাব লো তোর একাদশীর মনে;
মগনা ভগিনী মোরা প্রেম বিতরণে।।[১৬২]

কন্দর্পকান্তের মূর্খতায় আজিমা অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ফলে কন্দর্পকান্ত রেগে গিয়ে তার মাতামহীকে যথেচ্ছ গালাগাল করে,—*''হালার বিটী আজিমা আমারে একেবারে ডুবাইল...।''*[১৬৩] বৃদ্ধা মতামহীর প্রতি সম্মান নয়, 'বাবুয়ানার' প্রকাশ ঘটানোই কন্দর্পকান্তের লক্ষ্য। নাট্যকার এই বাবুয়ানিকে ব্যঙ্গ করেছেন। উনিশ শতকে তথাকথিত বাবুদের কার্যপ্রণালীতে বিধবা বিবাহ নিয়ে উদ্বেগ ও মেকি বিধবা বিধবা বিবাহের উদ্যোগকে *'বাবু'* নাটকে উপহাস করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর, বাল্য বিধবা ও নারীর শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিধবা বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। তিনি মূলত অক্ষতযোনি বিধবাদের বিয়ের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এবং যুবতী অবস্থায় যারা বিধবা হয়েছেন তাদের পুনর্বিবাহের কথা বলেছিলেন। *'বাবু'* নাটকে দেখা যায় বিপরীত ছবি। কন্দর্পকান্ত সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বৃদ্ধ আজিমাকে পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফলে, সমকালে প্রচলিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিপরীতমুখী উপহাসময় ছবি নাট্যকার *'বাবু'* নাটকে তুলে ধরেছেন।

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের *'শাস্তি কি শান্তি'* (১৯০৮) ,অমৃতলাল বসু *'খাসদখল'* (১৯১১), অমরেন্দ্রনাথ দত্তের *'ভ্রমর'* প্রভৃতি নাটকে বিধবা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে বিধবা নারীর ত্যাগ মহিমা ও ব্রহ্মচর্হপালনের কথাই বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১. *বিবাহ ও সমাজ,* গঙ্গেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *'নব্যভারত'* মাসিক পত্র ও সমালোচন, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত, ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, ৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, যোড়াসাঁকো কলিকাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত। অষ্টম খণ্ড, শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল, পৃ২২১।

২. *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসণ,* জয়ন্ত গোস্বামী, সাহিত্যশ্রী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল) কলিকাতা-৯, মহালয়া ১৩৬৭, পৃ ৪৩৫।

৩. *বাংলা প্রহসনের ইতিহাস,* অশোককুমার মিশ্র , মডার্ণ বুক এজেন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ কোজাগরী পূর্ণিমা কার্ত্তিক ১৩৯৫, ইং ২৪ অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ ২৮।

৪. *সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫,* রামনারায়ণ তর্করত্ন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা,পঞ্চম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৬, পৃ ২৫-২৬।

৫. ঐ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ২৫।

৬. *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র, ব্যাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৭৭৭ শকাব্দ মাঘ,[১৮৫৫], পৃ২৫৬।

৭. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব* , রামনারায়ণ তর্করত্ন (শর্ম্মা) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫

নং ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত, সম্বৎ ১৯১১ [১৮৫৪], পৃ ৩।

৮. *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, রামনারায়ণ তর্করত্ন (শর্ম্মা), ঐ, পৃ১০৯।

৯. সংবাদ ভাস্কর, সম্পাদকীয়, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, ৬৯ সংখ্যা, *সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র*, ৩য় খন্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, বীক্ষণ ১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০, পৃ ৩২৯-৩৩০।

১০. অনূদিত, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৬*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির কলিকাতা ১৩৪৬, প্রথম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৫১।

১১. *বিধবা বিবাহ নাটক* [১৮৫৬] ,উমেশচন্দ্র মিত্র, বাংলা নাট্যসংকলন ১ম খণ্ডপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও নৃপেন্দ্র সাহা, জুন ২০০১, পৃ ১৪৬।

১২. *ভারতীয় নাট্যমঞ্চ*, ১ম খণ্ড, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, ১২৪।৫বি, রসা রোড কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ১৮।

১৩. *রঙ্গালয়*, বিশ্বকোষ, ১৬ খণ্ড, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ৫ নং রাধারমন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩১২, পৃ১৭৭।

১৪. *The Life And Teachings of Keshub Chunder Sen, By P.C Mozoomdar, Calcutta,Printed And Published By J W Thomas, Baptist Mission Press, 1887, page 76-76.*

১৫. *বিধবা মনোরঞ্জন* [১ম খণ্ড ১৮৫৬, ২য় খণ্ড ১৮৫৭] রাধামাধব মিত্র, শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা গরানহাটা স্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে শ্রীসেখ সেরাজ জমাদের, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৭৯ শকাব্দ কলিকাতা।

১৬. *বিধবা মনোরঞ্জন*, ঐ, ভূমিকা অংশ, পৃ ৩।

১৭. ঐ, পৃ ৩৭।

১৮. ঐ, ৪২।

১৯. ঐ, ৪২।

২০. ঐ, ২৭।

২১. ঐ, ২৮।

২২. *কবিতাবলী* (পাঁচ খণ্ড), দীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত, গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৩ জানুয়ারি।

২৩. সম্পাদকীয় সম্বাদ ভাস্কর, ৬৯ সংখ্যা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, *সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র*, ৩য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, বীক্ষণ ১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬০, সম্পাদকীয়, পৃ. ৩০।

২৪. *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক ১৮৫৪-১৮৭৬*, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশনায় মোহম্মদ ইবরাহিম, মুদ্রণে ওবায়দুল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯০, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ.৬৮।

২৫. *চপলাচিত্তচাপল্য*, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯১৪ সংবৎ [১৮৫৭]।

২৬. *চপলাচিত্তচাপল্য*, নাটক ঐ, পৃ৬।

২৭. *চপলাচিত্তচাপল্য*, নাটক ঐ, পৃ ৬।

২৮. *চপলাচিত্তচাপল্য*, নাটক ঐ, পৃ ১৪।

২৯.*বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক, দ্বিতীয় পুস্তক*, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চতুর্থ সংস্করণ কলিকাতা ১৯২৯, পৃ ২৫।

৩০. *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৩৬২ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৯।

৩১. *দৃশ্যকাব্য পরিচয়*, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, প্রথম সংস্করণ ১৯৫০ পৃ ৩২।

৩২. *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য*, (১৮৫০-১৯০৫), প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত সাহিত্যশ্রী, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৬,পৃ ১০১।

৩৩. *রামনবমী*, গুণাভিরাম শর্ম্মা, ভূমিকা অংশ,কলিকাতা দাস এণ্ড সন্স যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, নং ৪০ সদন বড়ালের লেন, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ১৮৭০ খৃঃ অব্দ।

৩৪. *রামনবমী*, ঐ, পৃ ৮।

৩৫. *রামনবমী*, ঐ, পৃ ৭৭।

৩৬. *রামনবমী*, ঐ, পৃ ৮৪।

৩৭. *সপত্নী নাটক* (১৮৫৮) (প্রথম ভাগ) তারকচন্দ্র চূড়ামণি, নামপত্র, কলিকাতা ভাস্কর

যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯১৪।

৩৮. *সপত্নী নাটক* (১৮৫৮) ঐ, ভূমিকা অংশ।

৩৯. *সপত্নী নাটক* (১৮৫৮) ঐ, পৃ৪৫-৪৭।

৪০. *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, সাহিত্য সংসদ ৫ম সংস্করণ, জুলাই ২০১০, পৃ১৮৫।

৪১. *নীলদর্পণ*, কস্যচিৎ পথিকস্য, (দীনবন্ধু মিত্র) প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক, বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত, ১৭৮২ শকাব্দ। ২ আশ্বিন। ঢাকা, পৃ১৪।

৪২. *বিধবা বিরহ নাটক*, শিমূয়েল পিরবক্স, নামপত্র, ব্যপ্টিষ্ট মিশন প্রেস, কলকাতা ১৮৬০।

৪৩. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১২।

৪৪. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১৩।

৪৫. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১৩।

৪৬. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ১৪।

৪৭. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৩০।

৪৮. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৩১।

৪৯. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৩৭।

৫০. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৫৬।

৫১. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৬২।

৫২. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৩৫।

৫৩. *বিধবা বিরহ নাটক*, ঐ, পৃ ৩৫।

৫৪. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি, কলিকাতা সূর্য্যোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২ শকাব্দ, নির্বাচিত প্রহসন উনিশ শতক, সম্পাদনা অলোক রায়, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, মে ২০১৩, পৃ২৬৯।

৫৫. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, ঐ, পৃ২২৭।

৫৬. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, ঐ, পৃ২৭২।

৫৭. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, ঐ, পৃ২৭৯।

৫৮. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, ঐ, পৃ২৯২।

৫৯. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, ঐ, পৃ২৯৫।

৬০. *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, ঐ, পৃ৩০৭।

৬১. *দলভঞ্জন নাটক* (১৮৬১), হারাণচন্দ্র (শর্ম্মা) মুখোপাধ্যায়, নিবাধই, ১লা মাঘ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ২।

৬২. *দলভঞ্জন নাটক* (১৮৬১), ঐ পৃ ৪।

৬৩. *দলভঞ্জন নাটক* (১৮৬১), ঐ, পৃ ৩৩।

৬৪. ভূমিকা, *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* হরিশচন্দ্র মিত্র, নূতন যন্ত্র, ঢাকা(১২৬৯),পৃ৩।

৬৫. *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৩৩।

৬৬. *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৩৪

৬৭. *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৩৪।

৬৮. *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৩৪।

৬৯. *ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২)* ঐ, পৃ ৩৩-৩৪।

৭০. *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, ড. অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ ৩০-৩১।

৭১. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক* (১৮৬২) কুশদেব পাল, ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড কলিকাতা শীলএন্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ সাল, পৃ৫।

৭২. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৩০।

৭৩. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৩১।

৭৪. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৪৫।

৭৫. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৪৭।

৭৬. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৮।

৭৭. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৮।

৭৮. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৬৪।

৭৯. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৮০।

৮০. *আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৮০।

৮১. *পুনর্বিবাহ নাটক*, গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৬৯ সাল [১৮৬২] পৃষ্ঠা ৪৩।

৮২. *বাংলা প্রহসনের ইতিহাস*, অশোক কুমার মিশ্র, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৩ দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সং ১৩৯৫ কার্ত্তিক, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১১৪।

৮৩. ঐ,পৃ: ১১৪,

৮৪. *বিধবাবিলাস নাটক,* যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর ?য়টস ফ্রেণ্ড যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত বেহারিলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, ইংরেজি সন ১৮৬৪। বঙ্গাব্দ ১২৭১। মূল্য দশ আনা, ভূমিকা অংশ, পৃ ৪।

৮৫. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ৮।

৮৬. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ১৩।

৮৭. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ১৫ পৃ।

৮৮. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ১৭।

৮৯. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ২১।

৯০. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ৭৫।

৯১. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ৮৩।

৯২. *বিধবাবিলাস নাটক,* ঐ, পৃ ১৪৩।

৯৩. ভূমিকা অংশ, *নবনাটক,* রামনারায়ণ তর্করত্ন, ১৭৮৮ শকাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক এ নাটক মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

৯৪. *নবনাটক,* ঐ, পৃ ৮৬।

৯৫. *নবনাটক,* ঐ, পৃ ৮৬।

৯৬. *নবনাটক,* ঐ, পৃ ৮৬।

৯৭. *নবনাটক,* ঐ, প৯৪।

৯৮. *নবনাটক,* ঐ, প১০১।

৯৯. *নবনাটক,* ঐ, প১০১।

১০০. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি*, সম্পাদনা প্রশান্তকুমার পাল, সুবর্ণরেখা,১লা বৈশাখ ১৪১৯ সংস্করণ, পৃ১১৩।

১০১. উৎসর্গ পত্র, *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* দীনবন্ধু মিত্র, দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাদনা অজিত কুমার ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংস্করণ।

১০২. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১০৪।

১০৩. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১১১।

১০৪. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১১০।

১০৫. *বিয়ে পাগলা বুড়ো,* ঐ, পৃ ১১১।

১০৬. *মেঘনাদবধ নাটক,* ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক কালীকুমার চক্রবর্তী, ১৫ নং কলকাতা ঝামাপুকুর, বি.পি.এমস যন্ত্রে ছাপা, ১২৭৪ [১৮৬৭], বঙ্গাব্দের ২৮সে ভাদ্র, মূল্য বারো আনা, পৃ ৩০।

১০৭. *মেঘনাদবধ নাটক,* ঐ, পৃ৫১।

১০৮. *মেঘনাদবধ নাটক,* ঐ, পৃ ৫৬

১০৯. *বঙ্গকামিনী নাটক,* হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বি.পি.এমস যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১৫নং ঝামাপুকুর লেন, ১২৭৫ সাল [১৮৬৮] সালে প্রকাশিত, পৃ ৫৮।

১১০. *বঙ্গকামিনী নাটক,* ঐ,পৃ ৭৩।

১১১. *বঙ্গকামিনী নাটক,* ঐ, পৃ ৭৪।

১১২. উৎসর্গ পত্র, *হিন্দু মহিলা নাটক,* বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, ১৮৬৮ সালে কলকাতা 'আমাস্ট্রীট' হতে প্রকাশিত।

১১৩. *হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ১।

১১৪.*হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ৫।

১১৫.*হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ৮।

১১৬. *হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ২৩।

১১৭. *হিন্দু মহিলা নাটক,* ঐ, পৃ ৭১।

১১৮. *ভূমিকা অংশ, সাক্ষাৎ-দর্পণ নাটক,* অজ্ঞাতনামা রচিত, ১২৭৮ [১৮৭১] বঙ্গাব্দে, ২২১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দ্বৈপায়ণ যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

১১৯. *বিধবার দাঁতে মিশি,* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা,সূর্যপাড়া লেন, সিমলা, ১৮৭৪, পৃ৪৫।

১২০. *বিধবার দাঁতে মিশি,* ঐ, পৃ ৫২।

১২১. *শরৎ সরোজিনী,* দুর্গাদাস প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, পটলডাঙ্গা,

পটুয়াচোরাবালি, ১১ সংখ্যক ভবনে নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রী বামনসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৮৩ [১৮৭৬] সালে, পৃ ৪০।

১২২. *শরৎ সরোজিনী*, ঐ, পৃ ৫৫।

১২৩. *শরৎ সরোজিনী*, ঐ, পৃ ১২।

১২৪. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান* (১৮৭২-১৯০০), শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ১২১-১২২।

১২৫. *আত্মচরিত*, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৯১৮, পুনর্মুদ্রণ ২০০০, ২১১ বিধান সরণি, কলিকাতা ৭০০ ০০৬,পৃ ৯৯-১০০।

১২৬. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চম সংস্করণ আননর্দ পাবলিশার্স, পৃ৩২৫।

১২৭. প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, *সন্তাপিনী নাটক*, বামাবোধিনী, বৈশাখ ১২৮৩, পৃ ২৩।

১২৮. *সন্তাপিনী নাটক*, জনৈক ভদ্রমহিলা প্রণীত, বাগবাজার স্মিথ এণ্ড কোং, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, [১৮৭২] মূল্য এক টাকা, পৃ ৫২।

১২৯. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৩।

১৩০. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৭।

১৩১. *সন্তাপিনী নাটক*, ঐ, পৃ ৫৯।

১৩২. *এমন কর্ম্ম আর করব না*, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, আষাঢ় ১৭৯৯ শক, মূল্য দশ আনা, পৃষ্ঠা ৭।

১৩৩. *এমন কর্ম্ম আর করব না*, ঐ, পৃ ৫১।

১৩৪. *রবীন্দ্রস্মৃতি*, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ৩০।

১৩৫. *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, ৩৫।

১৩৬. ভূমিকা অংশ, *বঙ্গবিধবা*, বিরজামোহন চৌধুরী, ১৮৮২।(আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা জানা সম্ভবপর হয়নি।)

১৩৭. *বঙ্গবিধবা*, ঐ, পৃ ২৫

১৩৮. *বঙ্গবিধবা*, ঐ, পৃ ৪৬।

১৩৯. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান* (১৮৭২-১৯০০), শঙ্কর ভট্টাচার্য,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ২৩৯।

১৪০. *বিধবা সঙ্কট*, অজ্ঞাতনামা রচিত, কলিকাতা ১৫১ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট রিপণ প্রেস এজেন্সী থেকে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৯০ সাল, পৃ ১৫।

১৪১. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ২২।

১৪২. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৩৭।

১৪৩. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৩৮।

১৪৪. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৪৯।

১৪৫. *বিধবা সঙ্কট*, ঐ, পৃ ৬৬।

১৪৬. ভূমিকা, *তরুবালা*, অমৃতলাল বসু। (আখ্যাপত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রকাশকের নাম জানা যায়নি।)

১৪৭. *তরুবালা*, ঐ, পৃ ২৯।

১৪৮. *তরুবালা*, ঐ, পৃ ৩২।

১৪৯. *তরুবালা*, ঐ, পৃ ৩৭।

১৫০. *তরুবালা*, ঐ, পৃ ৪১।

১৫১. *তরুবালা*, ঐ, পৃ ৪১

১৫২. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান* (১৮৭২-১৯০০), শঙ্কর ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ৩৫৭।

১৫৩. *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'*, শ্রী অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ২নং মল্লিক লেন হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ৬ নং ভীমঘোষ লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস ইউ.সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, সন ১২৯৮ সাল। মূল্য ১০ আনা, পৃ২।

১৫৪. *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'*, ঐ, পৃ ১১।

১৫৫. *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'*, ঐ, পৃ ২৫।

১৫৬. *'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন'*, ঐ, পৃ ২৬।

১৫৭. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান* (১৮৭২-১৯০০), শঙ্কর ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ৩৬৪।

১৫৮. *বাবু*, অমৃতলাল বসু, *অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন*, সম্পাদনা ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁথি প্রকাশনার পক্ষে অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পি ৪০, ব্লক বি, বাঙুর এভেনিউ,

কলকাতা ৫৫, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩ মে ১৯৯৪, পৃ ১৭০।

১৫৯. *বাবু*, ঐ, পৃ১৯৫।

১৬০. *বাবু*, ঐ, পৃ ১৯৮।

১৬১. *বাবু*, ঐ, পৃ ১৯৯।

১৬২. *বাবু*, ঐ, পৃ ১৯৯।

১৬৩. *বাবু*, ঐ, পৃ ২০১।

———